দ্বি-মাসিক

শ্রমিকবার্তা

ষষ্ঠ বর্ষ ● সংখ্যা: ২১
সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০২২

শ্রমিক সংকট নিরসনে মালিক-শ্রমিকের দায়িত্ব

শ্রমিক পরিবারের সন্তান : শিক্ষাজীবন ও শিশুশ্রম প্রসঙ্গ

অধীনস্তদের সাথে রাসুলুল্লাহ (সা.) এর অনুপম আচরণ

চা বাগানে এখনো সূর্য ওঠেনি

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আর নয় ভাড়ায় বাড়ী
ভাড়ার টাকায় নিজের বাড়ী
কিনলে চল **কর্ণফুলী** ।

আমাদের প্রতিষ্ঠান সমূহ:

- কর্ণফুলী ডেভেলপারস্ (প্রা:) লি:
- কর্ণফুলী হাউজিং
- কর্ণফুলী গ্রীণ টাউন লি:
- কর্ণফুলী ফুড প্রোডাক্টস লি:
- এম.রহমান বিল্ডার্স

ফ্ল্যাট সাইজ

এ : ১৪০০ বর্গফুট
বি : ১৪০০ বর্গফুট
সি : ১৪০০ বর্গফুট
ডি : ১৪০০ বর্গফুট

কর্ণফুলী সাউথ ভিউ টাওয়ার

KGL

কর্ণফুলী গ্রুপ লিমিটেড

সম্পূর্ণ তৈরী প্লট, ফ্ল্যাট, বাড়ী এককালীন ও কিস্তিতে বিক্রয় চলছে
(ইসলামী শরিয়াহ্ মোতাবেক পরিচালিত)

টমছমব্রীজ, কুমিল্লা । মোবাইল : ০১৭১১-১১৮২৯৮, ০১৯৪১-৮৫৬২৬১
e-mail: karnafuly_housing@yahoo.com, Web: www.karnafulygroup.com

দ্বি-মাসিক

শ্রমিকবার্তা

৬ষ্ঠ বর্ষ ▪ সংখ্যা: ২১
সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০২২

▪ **সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি**
আ.ন.ম শামসুল ইসলাম

▪ **সম্পাদক**
এডভোকেট আতিকুর রহমান

▪ **নির্বাহী সম্পাদক**
এডভোকেট আলমগীর হোসাইন

▪ **সম্পাদনা সহযোগী**
নুরুল আমিন
আজহারুল ইসলাম
আবুল হাসেম

▪ **সার্কুলেশন**
আশরাফুল আলম ইকবাল

▪ **কম্পিউটার কম্পোজ**
আহমাদ সালমান

▪ **প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ**
ইউসুফ ইসলাম

▪ **প্রকাশকাল**
আগস্ট ২০২২

▪ **প্রকাশনায়**
বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন
৪৩৫, এলিফ্যান্ট রোড
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
www.sramikkalyan.org

▪ **মূল্য : ৩০ (ত্রিশ) টাকা**

সূচিপত্র

আল কুরআনে মানুষের পরিচয় মাওলানা আবুল হাসেম	০৩
শ্রমিক সংকট নিরসনে মালিক-শ্রমিকের দায়িত্ব ডা. শফিকুর রহমান	০৫
শ্রমিক পরিবারের সন্তান: শিক্ষাজীবন ও শিশুশ্রম প্রসঙ্গ ড. মাহফুজুর রহমান আখন্দ	১০
আদর্শ পরিবার গঠনে আল্লাহর রাসুল (সা) কতিপয় উসওয়াহ আব্দুদ্দাইয়ান মুহাম্মদ ইউনুছ	১৪
অধীনস্তদের সাথে রাসুল (সা) এর অনুপম আচরণ এডভোকেট আতিকুর রহমান	২০
মহানবী (সা) এর শ্রম প্রশাসন ড. মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম	২৪
চা বাগানে এখনো সূর্য ওঠেনি আশীষ মাহমুদ	২৭
যে অসহায় নারীর আর্তনাদে ওহী নাজিল হয় রোজিনা আখতার	৩০
বাংলাদেশের স্টিল ও রি-রোলিং শিল্প দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে আবুল হাশেম	৩২
শ্রমিক শ্রেণির মাঝে মাদকের ভয়ানক সয়লাব মুহাম্মদ হাফিজুর রহমান	৩৪
আইন জিজ্ঞাসা এডভোকেট আলমগীর হোসাইন	৩৮
ইসলামের দৃষ্টিতে নির্মাণ শ্রমিকের ত্যাগ, মর্যাদা ও অধিকার কাজী আবুল বাসার	৪০
ফেডারেশন সংবাদ	৪২

সম্পাদকীয়

শ্রমিকের শ্রমে রাষ্ট্র চলে। একই রাষ্ট্রে ক্ষুধার আগুনে শ্রমিকের পেট জ্বলে। প্রাতিষ্ঠানিক থেকে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত সর্বত্র একই দৃশ্য। একই হাহাকার আর কান্নার ছবি। পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে মালিকরা শ্রমিকদের রক্ত চূড়ান্তভাবে চুষে নিচ্ছে। শ্রমিকদের শ্রমের ওপর নিমার্ণ করছে তাদের সুখ-শান্তি আর অট্টালিকার সুউচ্চ দালান। অন্যদিকে সীমাহীন উর্ধ্বগতির দ্রব্যমূল্যের বাজারে শ্রমিকরা অন্তত দুবেলা কোনমতে খেয়ে বেঁচে থাকতে মুখ বুঝে সব জুলুম নির্যাতন সহ্য করে নিচ্ছে। চাকরিচ্যুত হওয়ার ভয়ে মালিকের অন্যায়ের বিরুদ্ধে কেউ কথা বলার সাহস করে না।

দিনে মাত্র ৩০০ টাকার মজুরির দাবিতে চা শ্রমিকদের যখন দীর্ঘদিন ধর্মঘট চালিয়ে যেতে হয় তখন বুঝতে আর বাকি থাকে না দেশের শ্রমজীবী মানুষ কতটা সুখে আছে। কতটা অবর্ণনীয় কষ্টে তাদের দিন চলছে। চা শ্রমিকদের আজকের এই ধর্মঘট হঠাৎ করে কোন জেগে ওঠা আন্দোলন নয় বরং ১৬৮ বছর যাবত তাদের ওপর চলা শোষণ-নিপীড়নের ক্ষুদ্র বহিঃপ্রকাশ মাত্র। ১৩ আগস্ট থেকে শুরু হওয়া ধর্মঘটের সমাপ্তি ঘটেছে ২৭ আগস্ট। প্রধানমন্ত্রী চা বাগানের মালিকদের সাথে বৈঠক করে চা শ্রমিকদের মজুরি ১২০ টাকা থেকে ১৭০ টাকা নির্ধারণ করেছেন। চা শ্রমিকরা বাধ্য হয়ে এই মজুরি মেনে কাজে ফিরেছেন। কিন্তু জাতির সামনে তারা নীরব প্রশ্ন রেখে গেলেন, "এই দ্রব্যমূল্যের বাজারে এত স্বল্প আয়ে কীভাবে তাদের সংসার চলবে?" আজ নিত্যপ্রয়োজনীয় সকল দ্রব্যমূল্য শ্রমজীবী মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে। অথচ শ্রমিকের শ্রমমূল্য বাড়েনি। শ্রমিকের এই দুর্দিনে মালিক-রাষ্ট্র নীরব ভূমিকা পালন করছে। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর এই দুর্দিনে রাষ্ট্র কীভাবে নীরব থাকে আমাদের বুঝে আসে না। এমতাবস্তায় নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য শ্রমজীবীসহ সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে নিয়ে আসার জন্য সরকারের পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরী।

রবিউল আউয়াল মাস আমাদের নিকট সমাগত। যে মাসে পৃথিবীর বুকে আগমন করেছিলেন বিশ্বমানবতার মুক্তির দূত মুহাম্মদ (সা)। মানুষের দুনিয়ায় কল্যাণ ও আখিরাতে মুক্তির নিমিত্তে তিনি মদিনায় সর্বপ্রথম কুরআনের আলোকে একটি আদর্শিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করলেন। যে রাষ্ট্রে ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলের নাগরিক ও মানবিক অধিকার সুসংহত ছিলো। যে রাষ্ট্রে কর্ম ও অর্থ-সম্পদের ভিত্তিতে নয়, মানুষের মর্যাদা নিশ্চিত হতো আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে। যে রাষ্ট্রে শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে মর্যাদাগত দিক থেকে কোন পার্থক্য ছিলো না। ফোসকা পড়ে যাওয়া শ্রমিকের হাতে রাসুল (সা) তার পবিত্র মুখ দিয়ে চুম্বন করতেন। শ্রমিকের মজুরি ঘাম শুকানোর পূর্বে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। একই সাথে শ্রমিককে সাধ্যের অতীত কোন কাজ না দেওয়ার কথা বলেছেন। রাসুলের এই শ্রমনীতি সর্বকালের মানুষের জন্য মানবিক-আদর্শিক শ্রমনীতি। এই শ্রমনীতির মধ্যে শ্রমিকদের কল্যাণ নিহিত রয়েছে। আজকে বিশ্বব্যাপী শ্রমিক সমস্যা দূর করার জন্য সকল শ্রমজীবী মানুষদের সেই প্রকৃত সত্যের দিকে ফিরে আসা প্রয়োজন। আমরা শ্রমজীবী ভাইবোনদের সেই চির সত্যের পথ আল-কুরআন ও রাসুল (সা) এর সুন্নাহ দিকে ফিরে আসার উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।

আল কুরআনে মানুষের পরিচয়

মাওলানা আবুল হাসেম

মানুষ আল্লাহ তায়ালার অতি গুরুত্বপূর্ণ সৃষ্টি, আশরাফুল মাখলুকাত তথা সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে ভূষিত করা হয়ে থাকে মানুষকে। শারীরিক গঠন কিংবা শক্তিমত্তার বিচারে এ শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়নি মানুষকে। বিবেক বুদ্ধির মাপকাঠিতে সত্য মিথ্যা যাচাইয়ের অনুপম বৈশিষ্ট্য সৌন্দর্যমণ্ডিত হলো এ মানবজাতি। গোটা সৃষ্টি জগতকে সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বাসযোগ্য করার ব্যতিক্রমধর্মী দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এ জাতিকে; যা খিলাফতেরই অংশ বটে।

আল্লাহ তায়ালার নাযিলকৃত সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী গ্রন্থ হলো আল কুরআন। যাতে রয়েছে পাহাড় পর্বতের চমৎকার বর্ণনা, আসমান জমিনের বিশালত্বের দৃষ্টান্ত উপস্থাপনা, মহাকাশ, চন্দ্র, সূর্য, রাত দিনের আবর্তন বিবর্তনের অসাধারণ বর্ণনাশৈলী, বাদ যায়নি এতে মশা, উকুন, মাছির মতো অতি নগণ্য জীবের আলোচনা; গরু, ছাগল, ভেড়ার মতো গৃহপালিত জন্তুর আলোচনা যেমন সন্নিবেশিত হয়েছে এ মহাগ্রন্থে, তেমন বাঘ, সিংহ, গাধার মতো বন্য প্রাণীর আলোচনাও উপস্থাপিত হয়েছে অত্যন্ত সুনিপুণভাবে। আকাশে বিচরণশীল পাখির বৈশিষ্ট্য যেমন তুলে ধরা হয়েছে, ঠিক পানিতে সাঁতার কাটা মাছেরও উল্লেখ রয়েছে এতে। কিন্তু গোটা কুরআনের কোথাও একবারের জন্যও উচ্চারিত হয়নি, "ওহে গরু" অথবা "ওহে আকাশ" সম্বোধন করে। অথচ বারবার উচ্চারিত হয়েছে, "ওহে মানব সকল।" এর দ্বারাই অনুমিত হয় মহাগ্রন্থ আল কুরআনের অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ ও কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়ই হলো মানুষ। নিম্নে কুরআনের আলোকে আমরা মানুষের সৃষ্টির সূচনা, গঠন প্রক্রিয়া, মানুষের দায়িত্ব কর্তব্য, মানুষের বৈচিত্রময়ী বৈশিষ্ট্যের একটা চিত্র তুলে ধরার প্রয়াস পাব, ইনশাআল্লাহ।

মানব সৃষ্টির সূচনা ইতিহাস সবারই জানা। সুরা বাকারার ৩০ নং আয়াতে রয়েছে এর চমৎকার বর্ণনা। আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাগণকে নতুন এ সৃষ্টির ব্যাপারে ধারণা দিলেন, তাঁরা ভবিষ্যতে মানুষের দ্বারা সৃষ্ট বিশৃঙ্খলা ও রক্তপাতের আশঙ্কা ব্যক্ত করে ভিন্নমত প্রকাশ করেছেন, নিজেদের ইবাদাত বন্দেগীর উপর আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে নতুন সৃষ্টির অপ্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছেন। কিন্তু মহান আল্লাহ তায়ালা জ্ঞানের পরীক্ষায় প্রথম মানব আদমকে (আ.) শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে ফেরেশতাগণের উপর সম্মানিত করেছেন এবং এ জাতিকে খিলাফতের দায়িত্ব দিয়ে পৃথিবীকে সুশৃঙ্খলভাবে আবাদ করার মতো মহান জিম্মাদারীতে ভূষিত করেছেন। ফেরেশতার মোকাবিলায় যে মানুষকে সম্মানিত করা হয়েছে, সে মানুষ জাতির সদস্য হিসেবে আমাদের দায়িত্ববোধ কতটা মজবুত হওয়া কাম্য; তা ভাবতেই শরীরে অন্যরকম শিহরণ অনুভূত হয়।

মানুষের গঠনাকৃতি কাঠামোগত দিক থেকে সর্বোত্তম বৈশিষ্ট্যের অর্ন্তভূক্ত। কিন্তু এর গড়ে উঠার প্রক্রিয়া অত্যন্ত দুর্বলভাবে রাখা হয়েছে, যাতে মানুষ নিজের সৃষ্টির তুচ্ছতা উপলদ্ধি করে অহংকার থেকে মুক্ত থাকতে পারে। যুগের পর যুগ মানুষ অস্তিত্বহিন থাকা, এক ফোঁটা বীর্যের মাধ্যমে জীবনের সূচনা হওয়া, ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকে দীর্ঘ সময় ধরে অন্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে বেড়ে উঠা, সামান্য অসুস্থতায় কাতর হয়ে নিজের প্রচণ্ড সীমাবদ্ধতা আঁচ করতে পারার মতো; এমন ব্যতিক্রমী গঠন প্রক্রিয়াই মানব জীবনের অনিবার্য বাস্তবতা। সুরা আম্বিয়ার ১০ নং আয়াতে বলা হয়েছে, "আমি তোমাদের নিকট কিতাব নাযিল করেছি, যাতে রয়েছে তোমাদের-ই আলোচনা, তোমরা কি ভাববে না?" সত্যিই কুরআনে রয়েছে আমাদেরই কথা, আমাদেরই বর্ণনা। আমরা মানুষ কী করব? কোথায় থেকে এসেছি আমরা? জীবনের নির্ধারিত সীমা শেষ করে আমরা আবার কোথায় ফিরে যাব? কী আমাদের দায়িত্ব? কেমন আমাদের বৈচিত্রময়ী বৈশিষ্ট্য? কোনটা অনালোচিত রয়েছে এ মহাগ্রন্থে? আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, "এ মাটি থেকেই আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, এরই মধ্যে আমি তোমাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যাব এবং এ থেকেই আবার তোমাদেরকে বের করব।" (সুরা ত্বহা : ৫৫)

"তোমরা কি মনে করেছ, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি? তোমাদেরকে কি আমার কাছে ফিরে আসতে হবে না?" (সুরা মুমিনুন : ১১৫)

"আমি অবশ্যই জীন এবং মানুষকে আমার ইবাদাত ছাড়া ভিন্ন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি।" (সুরা যারিয়াত : ৫৬)

মানুষের বৈচিত্রময়ী বৈশিষ্ট্য: বলা হয়ে থাকে, "হাজার মানুষ হাজার মত।" বাস্তবিকই অজুত কোটি মানুষের চিন্তা-ভাবনা, জীবনাচার, অনুভূতি, দৃষ্টিভঙ্গি অজস্র ধরনের। মনে হয় যেন প্রতিটি মানুষ স্বতন্ত্র, কারো সাথে কারো সম্পূর্ণ মিলে যাওয়ার প্রশ্নই আসে না। কেউ রাগী আবার কেউ সরল, কেউ বিনয়ী আবার কেউ ঔদ্ধত্য প্রকাশকারী, কেউ অস্থির আবার কেউ সুস্থির, কেউ বিচক্ষণ আবার কেউ আনাড়ি, কেউ বিশ্বাসী আবার কেউ অবিশ্বাসী, কেউ কেউ জ্ঞান ও যুক্তিবোধের যথেষ্ট অনুরাগী আবার বিপরীতে কেউ হলো গোঁড়া প্রকৃতির; এভাবে মানুষের নানা বৈচিত্রময়ী বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে আল কুরআনে।

কুরআনে আমরা দেখি, মানুষ যখন আল্লাহ তায়ালার বিধানের যথাযথ আনুগত্য করে তখন তারা সেরা জীবের মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখে, বিপরীতে যখন সে দেখেও দেখে না, শুনেও শুনে না, হৃদয় দিয়ে সত্য সুন্দরের উপলদ্ধি করে না; তখন সে চতুষ্পদ জন্তুর চেয়েও জঘন্য হিসেবে পরিগণিত হয়। অনেক মানুষ নিজের আত্মপরিচয় জানে না, সে নিজেকে এত তুচ্ছ ও হীন মনে করে যে, সে তার মতো অন্যান্য সৃষ্টি যেমন গাছ, পাথরের কাছে মাথানত করে আত্মমর্যাদা ভুলুণ্ঠিত করে। বিপরীতে এমন মানুষও আছে যারা নিজের সৃষ্টির সূচনা ভুলে গিয়ে আত্ম অহংকারে ফুলে উঠে, স্বয়ং তার স্রষ্টার সাথে বাক বিতণ্ডায় লিপ্ত হয়, নিজেকে সার্বভৌম দাবি করে বসে। যেমন ফেরাউন তার অধীনস্তদের বলেছিল, "আমিই তোমাদের সবচেয়ে বড়ো প্রভু।" (সুরা নাযিয়াত : ২৪)

এ জন্য আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, "অতএব মানুষের দেখা উচিত, তাকে কোথায় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে? তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সবেগে উত্থিত (তুচ্ছ) পানি থেকে।" (সুরা তারেক : ৫-৬)

"মানুষ কি দেখে না, তাকে আমি সৃষ্টি করেছি শুক্রবিন্দু থেকে এবং তারপর সে দাঁড়িয়ে গেছে স্পষ্ট ঝগড়াটে হয়ে? এখন সে আমার ওপর উপমা প্রয়োগ করে এবং নিজের সৃষ্টির কথা ভুলে যায় বলে, এ হাড়গুলো যখন পঁচে গলে গেছে এতে আবার প্রাণ সঞ্চার করবে কে? তাকে বলো, এদেরকে তিনি জীবিত করবেন যিনি প্রথমে এদেরকে সৃষ্টি করেছিলেন এবং তিনি সৃষ্টির প্রত্যেকটি কাজ জানেন।" (সুরা ইয়াছিন : ৭৭-৭৯)

কত নিখুঁত এবং আশ্চর্যজনক প্রক্রিয়ায় মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে, তা ভাবলে কৃতজ্ঞতায় মস্তক অবনত হয়ে আসে। এবং নির্ধারিত হায়াত শেষ করে আবার তাঁর কাছেই ফিরে গিয়ে কড়া গণ্ডায় হিসাব দিতে হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, "আমি মানুষকে তৈরি করেছি মাটির উপাদান থেকে, তারপর তাকে একটি সংরক্ষিত স্থানে টপকে পড়া ফোঁটায় পরিবর্তিত করেছি, এরপর সেই ফোঁটাকে জমাট রক্তপিণ্ডে পরিণত করেছি, তারপর সেই রক্তপিণ্ডকে মাংসপিণ্ডে পরিণত করেছি, এরপর মাংসপিণ্ডে অস্থি-পিঞ্জর স্থাপন করেছি, তারপর অস্থি-পিঞ্জরকে ঢেকে দিয়েছি গোশত দিয়ে, তারপর তাকে দাঁড় করেছি স্বতন্ত্র একটি সৃষ্টি রূপে। কাজেই আল্লাহ বড়োই বরকত সম্পন্ন, সকল কারিগরের চাইতে উত্তম কারিগর তিনি। এরপর তোমাদের অবশ্যই মরতে হবে, তারপর কেয়ামতের দিন নিশ্চিতভাবেই তোমাদের পুনরুজ্জীবিত করা হবে।" (সুরা মুমিনুন : ১২-১৬)

মানুষ এক সংগ্রামী জীব, তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে পরিশ্রম প্রিয়তার মধ্যে। "আসলে আমি মানুষকে কষ্ট ও পরিশ্রমের মধ্যে সৃষ্টি করেছি, সে কি মনে করে রেখেছে, তার ওপর কেউ জোর খাটাতে পারবে না?" (সুরা বালাদ : ৪-৫) এ চেষ্টা-প্রচেষ্টা, সংগ্রাম চলতে হবে মহান রবের কাঙ্ক্ষিত সান্নিধ্য পাওয়া পর্যন্ত। কুরআনের বাণী, "হে মানুষ! তুমি কঠোর পরিশ্রম করতে করতে তোমার রবের দিকে এগিয়ে যাচ্ছো, পরে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করবে।" (সুরা ইনশিকাক : ৬)

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা যেভাবে মানুষের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন, প্রতিটি ব্যক্তিই তার নিজ বৈশিষ্ট্যের চিত্র কুরআনের মধ্যে দেখতে পাবে, সে যেমন মানুষই হোক না কেন ভালো কিংবা মন্দ। কোটি কোটি মানুষের এমন একজনও পাওয়া যাবে না, যার চিত্র কুরআনে না অঙ্কিত হয়েছে।

কুরআনে আলোচিত সাধারণত মানুষের কমন চিত্র হলো, বিপদে আল্লাহ তায়ালাকে কাতর কণ্ঠে ডাকে, বিপদ চলে গেলে অহংকারী হয়ে যায়, মনের চাহিদা অনুযায়ী পূর্ণ প্রাপ্তি না হলে হতাশ হয়, আবার কাঙ্ক্ষিত কিছু ফেলে অকৃতজ্ঞ হয়, একটু শক্তিমান হলেই দুর্বলের উপর জুলম চালায়, ভালো কাজের খুব দ্রুত পুরস্কার পেতে চায় অথচ মন্দ কাজের পরিণতি বহু পরে দেখলেও আঁতকে উঠে। কেউ কেউ প্রচণ্ড সংকীর্ণ মনা স্বভাবের, কারো জন্য হাত বাড়াতে চায় না।

পরকালের জবাবদিহিকে অসম্ভব মনে করে অস্বীকার করে, লাগামহীন উটের মতো চলতে চায়, দায়িত্ব পদ-পদবী পেতে যতটা উদগ্রীব থাকে, তা পালনে ততটা সচেতন থাকে না। দায়িত্বের মতো বিশাল আমানত বহন করে খেয়ানত করে নিজেকে জালিম হিসেবে গণ্য করে, আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত নিয়ামতকে তাঁর দান না মনে করে, নিজের জ্ঞান ও দক্ষতার ফল মনে করে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে। ভালো কিছু পাওয়ার জন্য দোয়া করতে ক্লান্ত হয় না, কিন্তু সামান্য মন্দ পরিস্থিতির শিকার হলেই হতাশ হয়ে যায়। সমজাতীয় মানুষকে বিশেষ মর্যাদা দিয়ে আল্লাহ তায়ালার কর্তৃত্ব ও গুণাবলীর সাথে শিরক করে। অনবরত অপরাধ করতেই থাকে এমনকি ভবিষ্যতেও অপরাধ অব্যাহত রাখতে চায়, এতকিছুর পরও নিজের অপরাধ স্বীকার না করে অজুহাত পেশ করে দায়মুক্তি চায়। সে মনে করে আল্লাহর পাকড়াও থেকে রক্ষা পাবে, কিন্তু তা মোটেই সম্ভব নয়।

এভাবেই আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে মানুষের বাস্তব চিত্র অঙ্কন করেছেন। তিনি সব জানেন, তাঁর কাছে মানুষের হৃদয়ের গভীরে লুকায়িত অপ্রকাশিত মনোভাবও অজানা নয়, কারণ তিনিই স্রষ্টা। তিনি বলেছেন, "যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনিই কি জানবেন না? অথচ তিনি সূক্ষ্মদর্শী ও সব বিষয় ভালভাবে অবগত।" (সুরা মুলক : ১৪)

অতএব সকল ধরনের মন্দ বৈশিষ্ট্য পরিহার করে, আল্লাহ তায়ালার কাঙ্ক্ষিত চরিত্র অর্জন করে, আশরাফুল মাখলুকাত এর মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখাই হলো মানুষ হিসেবে আমাদের দায়িত্ব।

লেখক: ইসলামী চিন্তাবিদ

শ্রমিক সংকট নিরসনে মালিক-শ্রমিকের দায়িত্ব

ডা. শফিকুর রহমান

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন, ওয়াসসালাতু, ওয়াসসালামু আলা রাসুলিহিল কারিম, ওয়ালা আলিহি, ওয়া আসহাবিহি, ওয়া আহলে বাঈতিহি আজমাঈন।

শ্রমিক অঙ্গনের মজলুম মানুষের মুক্তিকামী সংগঠন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ৮৯ টি শাখার কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য ভাইদের নিয়ে আয়োজিত আজকের এই মোবারক আয়োজনের সম্মানিত সভাপতি-সঞ্চালক, কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীল-মেহমানবৃন্দ ও ডেলিগেট বন্ধুগণ আল্লাহ তাবায়ারকু তায়ালার শুকরিয়া আদায় করছি পবিত্র জুমআ বারে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মেহনতি ও মজলুম মানুষের মুক্তির ঠিকানা এই সংগঠনের আজকের এই আয়োজনে আমাদের সকলকে শামিল হওয়ার তাওফিক দান করেছেন আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন। শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনকে আমি আন্তরিক শুকরিয়া জানাই তারাও আমাকে আপনাদের সাথে শরিক হওয়ার জন্য দাওয়াত করে-ছিলেন। যার ফলে আমিও সুযোগ পেলাম আপনাদের সাথে শামিল হওয়ার। জাযাকুমুল্লাহু খাইরান।

সম্মানিত ভাইয়েরা

বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে কার্যকরভাবে চিন্তা করতে গেলে ৬৮-৭০ ভাগ মানুষই শ্রমের সাথে সম্পর্কিত এবং তাদের সকলকেই শ্রমজীবী বলা হয়। বিশেষ পেশায় বিশেষ কাজের জন্য তাদের শ্রমজীবী হিসেবেই বিবেচনা করা হয়ে থাকে। ৩০ ভাগ মানুষ যারা শ্রমের সাথে সম্পর্কিত নয়, তারা হয়ত অসুস্থ না হয় বয়োবৃদ্ধ অথবা তারা অপ্রাপ্তবয়স্ক কিংবা তাদের একটা অংশ হয়তো বয়স হলেও লেখাপড়া সাথে সম্পর্কিত। সরাসরি কোন সামাজিক বা প্রাতিষ্ঠানিক কাজের সাথে কোন রকম সম্পৃক্ত না। আমি সহ বাকি সকল মানুষ পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষভাবে শ্রমের সাথে সম্পৃক্ত। এর মধ্যে থেকে বিশেষভাবে যারা হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে দেশ এবং দেশের অর্থনীতির চাকাকে গতিশীল রাখেন এবং গতিশীল করেন তাদেরকে চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী বিবেচনা করা হয় অথবা এরও নিচের দিকে বিবেচনা করা হয়। তাদের সাথে আচার-ব্যবহার চতুর্থ শ্রেণির মানুষ হিসেবেই করা হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যারা দায়িত্বশীল কর্মকর্তা আছেন বা মালিকপক্ষ আছেন, তারা অনেক সময় ইনসাফ করেন না। অনেক ক্ষেত্রে শ্রমিকরা মালিকদের নিকট থেকে অবহেলা বঞ্চনা এবং দুর্ব্যবহারের শিকার হয়ে থাকেন। এটি যুগ যুগ ধরে চলে আসছে।

মানুষের দুর্বল দিকগুলোকে কেন্দ্র করে এর সমাধানের নামে বেশ কিছু শ্রমিক সংগঠন তৈরি হয়েছে। বেশিরভাগ শ্রমিক সংগঠনই বামপন্থীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। তারা লাল পতাকা হাতে নিয়ে চমৎকার স্লোগান দেয়। কিন্তু দিন শেষে দেখা যায় যে শ্রমিকদের ভাগ্যকে কেন্দ্র করে ঐসমস্ত লাল পতাকাওয়ালা নেতারা নিজেদের ভাগ্যকে গড়ে নেয়। শ্রমিক যে তিমিরে ছিলো সে তিমিরে থেকে যায়। তাদের আর কপালে কোনো পরিবর্তন হয় না। সত্যিকার অর্থে তাদের জীবনে বড়ো কোন পরিবর্তন আসে না। তাদের হক এবং অধিকারের ব্যাপারে নতুন কোন অধ্যায় জন্ম নেয় না। বরং এ ধরনের আন্দোলন সংগ্রাম করতে গিয়ে অনেক শ্রমিক পরিস্থিতির শিকার হয়ে যায়। কেউ ছাঁটাই হয় আবার কেউ মামলার ফাঁদে পড়ে এখান থেকে বাহির হয়ে যায়। আরেকটা নতুন অভিশাপ তার জীবনে এসে দেখা দেয়। যারা নেতৃত্বের জায়গায় থাকে তাদের কোনো সমস্যা হয় না। তারা এদিক সেদিক দর-কষাকষি করে জীবন চালিয়ে নেয়।

এই যে লাল পতাকাওয়ালারা আজীবন ধরে শ্রেণি সংগ্রামের কথা বলে আসছে, এরা সমাজকে বিভিন্ন শ্রেণিতে নিজেরাই বিভক্ত দেখতে চায়। এক শ্রেণির বিরুদ্ধে আরেক শ্রেণিকে তারা ক্ষেপিয়ে তুলতে চায়। দুইটা শ্রেণি যখন পরস্পরের মুখোমুখি হয়ে যায় সেখানে সমন্বয় সহযোগিতা আর থাকে না। সেখানে কোন ধরনের ভ্রাতৃত্ব এবং মানবতা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। সেখানে এক শ্রেণি কিভাবে আরেক শ্রেণিকে দমন করবে এবং বৈধ-অবৈধ যেকোনোভাবেই হোক নিজের স্বার্থকে হাসিল

করার চেষ্টায় নিয়োজিত থাকে। এ সংগ্রামটাই চিরন্তন চলে আসছে। ফলে কর্মের জায়গায় কর্ম উপযোগী পরিবেশ তৈরি হয় না। এ কারণেই শুধু শ্রমিকরাই শুধু ক্ষতিগ্রস্ত হয় না বরং কিছু ক্ষেত্রে মালিকরাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ক্ষিপ্ত শ্রমিকদেরকে এমনভাবে উত্তেজিত করা হয় যে মাঝেমধ্যে সে তার রিজিকের ঠিকানায় আঘাত করে বসে। আগুন দিয়ে ও ভাঙচুর করে ক্ষতিসাধন করে বসে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দেওয়া বিধি-বিধান ও রাসুল (সা) শ্রমিকদের প্রতি যে সম্মান প্রদর্শন করার হুকুম দিয়েছেন তা যদি মালিকরা পরিলালন করতো তাহলে এখানে শ্রেণি সংগ্রাম এবং শ্রেণি সংঘাত সৃষ্টি হতো না। একটি জটিল ফর্মুলার আবর্তে যুগের পর যুগ মানুষ পড়ে আছে। মালিকপক্ষ ছলে বলে কৌশলে লাভবান হতে চায়। শ্রমিকের রক্তে গড়া ঘামের বিনিময় হলেও তার সম্পত্তি বাড়াতে চায়। এমন কিছু মালিক আছেন যারা বৈধ-অবৈধভাবে অর্থ-সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলেন। অথচ এসব সম্পদ নিজে ভোগ করে যেতে পারেন না। তারা অনেকে দেশের টাকা বিদেশে পাচার করে এবং এর দ্বারা ঐ দেশের সরকার এবং জনগণ অনেক উপকৃত হয়।

কিন্তু তা অবৈধ সম্পদ মালিকদের কোন উপকারে আসে না। বরং এসব সম্পদের জন্য দুনিয়াতে তাদের লাঞ্ছিত হতে হয়। চরম অশান্তির মধ্যে তাদের সময় কাটে। তাদের হায়াতটা এরকমভাবে চলে যায়। তবে হ্যাঁ, কেউ কেউ নিজের অপরাধ উপলব্ধি করে সে ফিরে আসে আল্লাহর দিকে। তওবা করে দ্বীনের পথে যদি ফিরে আসে আল্লাহ তাকে হয়তোবা পথ দেখাবেন। তাকে ক্ষমা করে দিবেন। একটা পবিত্র জীবন তাকে দান করবেন। দ্বীনের পথে যে ব্যক্তি চলে আসবে সে আর মানুষের ওপর আর জুলুম করবে না। কিন্তু খুব কম ব্যক্তি দ্বীনের পথে ফিরে আসে।

হাড়াভাঙা পরিশ্রম করা সত্ত্বেও শ্রমিকরা বিভিন্ন ধরনের সমস্যায় জর্জরিত। তারা তাদের পরিবারের চাহিদা পূরণ করতে পারে না। ফলে বাধ্য হয়ে অনেকে অবৈধ পথে পা বাড়ায়। অবৈধ পথে অনেক শ্রমিক হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়। অনেকে মানসিক যন্ত্রনায় আত্মহত্যা করে বসে। অনেকের পরিবার ভেঙ্গে যায়। সন্তানরা পরিবার ছেড়ে চলে যায়। স্বামী স্ত্রীকে ছেড়ে আবার স্ত্রী স্বামীকে ছেড়ে চলে যায়। পারিবারিক অশান্তিতে তারা অপরাধ জগতে হারিয়ে যায়। তখন কিছু ব্যক্তি এই সমস্ত মানুষের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাদের বাসস্থানে অপরাধের স্বর্গরাজ্য গড়ে তুলে। মদ, জুয়া ও নারীর আসর বসিয়ে নানা অপকর্ম করে গরীব মানুষদের আরও নিঃস্ব করে তুলে।

শ্রমিকের সন্তানরা পড়ালেখার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। পরিবারের পক্ষ পড়াশোনার ব্যয়ভার মেটানো সম্ভব হয় না। শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হয়ে তারা অপরাধ জগতে জড়িয়ে পড়ে। গডফাদাররা শুরুতে বিনামূল্যে মাদক দিয়ে তাদের মাদকাসক্ত করে তোলে। পরবর্তীতে এর ফায়দা তারা লুটে নেয়। এসব সন্তানদের দিয়ে তারা মাদকের কারবার করে থাকে। সামান্য অর্থের বিনিময়ে তারা নিজের অজান্তে জড়িয়ে পড়ে ভয়াবহ অপরাধে। এই জগত থেকে তার পক্ষে আর বের হওয়া সম্ভব হয় না। জীবনের এরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ সময় হারিয়ে তাদের জীবনে হাহাকার দেখা দেয়। এই অশান্তির সুযোগে গডফাদারা তাদের হাতে অস্ত্র তুলে দেয়। চুরি-ছিনতাই হতে শুরু করে মানুষ খুন তাদের নেশা হয়ে যায়। অপরাধের কালোছায়া তাদেরকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। সমাজের চোখে এরা হয়ে যায় ইতর ও বন্যপ্রাণী। তাদেরকে আর মানুষ হিসেবে গণ্য করা হয় না।

শ্রমিকের সন্তানদের ঘুম ভাঙ্গার পর প্রথম নজর যায় মালিকের ১০ তলার বাড়ির দিকে। সুউচ্চ দালান তার মধ্যে প্রতিহিংসা জন্ম দেয়। সেভাবে তার পিতা-মাতার পরিশ্রমের ফসল হিসেবে মালিক এই বাড়ি করেছে। অথচ তারা সহায় সম্বলহীন। তার মধ্যে প্রতিহিংসা থেকে প্রতিশোধের স্পৃহা জাগ্রত হয়। সে মালিককে একটি শিক্ষা দিতে চায়। এই শিক্ষা দিতে গিয়ে সে ভয়ঙ্কর অপরাধে জড়িয়ে যায়। একটি পর্যায়ে পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়ে আজীবন জেলে কাটাতে হয়। তার কাছে মামলা পরিচালনা করার মতো অর্থ থাকে না। ফলে তার মামলা দেখার মতো আর কেউ থাকে না। এই হতাশা নিয়ে তাকে জেলের অন্ধপ্রকোষ্ঠে কাটিয়ে দিতে হয় সারাজীবন।

২০১৩ সালে আমি জেলে এক ব্যক্তিকে দেখেছি। যিনি বয়স বিবেচনায় মুক্তি পাওয়া সত্ত্বেও জেল থেকে বের হননি। তাকে বলা হলো সাজার মেয়াদ শেষ, আপনি মুক্ত। তিনি বললেন, আমি কোথায় যাবো। আমার বয়স ৮২। আমার স্ত্রী মারা গেছে। আমার সন্তানরা কোথায় আছে আমি জানি না। যতদিন তারা পেরেছে সম্পত্তি বিক্রি করে মামলা চালিয়েছে। এখন কিছুই নেই। আমি জেলে আমৃত্যু কাটিয়ে দিবো। আমার মউত এখানেই হোক আল্লাহর কাছে এটাই চাই। কি বেদনাদায়ক দৃশ্য। একটি সমাজ রাষ্ট্র কতটা ধ্বংসের পথে পরিচালিত হলে এমন দৃশ্য আমাদের দেখতে হয়।

ইসলাম কি চায় এ সমস্ত যন্ত্রণার মোকাবেলায় ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কি? আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পরিষ্কারভাবে তার নবী করিম (সা) কে দিয়ে তার বাস্তব নমুনা নিজেই পেশ করেছেন। নবী (সা) এর জীবনের প্রতিটি ঘটনা শিক্ষণীয়। তার জন্ম থেকে ওফাত পর্যন্ত প্রত্যেকটি বিষয় মানুষের জন্য শিক্ষনীয়। জীবনের সূচনালগ্নে তিনি নিজেই অসহায় একজন মানুষ ছিলেন। না তার কোন সহায় সম্বল ছিল, না তার পিতা-মাতা ছিলেন। তার অন্য একটা বড়ো ভাই নেই যে তাকে সাপোর্ট দিবে। এরকম সহায় সম্বলহীন একজন মানুষ হিসেবেই তিনি এজগতে বেড়ে উঠতে লাগলেন। সে সময়টা তিনি নিজেই কতটা কঠোর পরিশ্রম করেছেন। কারো ছাগল চড়িয়েছেন। কারো উট চড়িয়েছেন। কারো কূপ থেকে পানি তুলে তিনি আয় উপার্জন করেছেন। বহু পরিশ্রম করে হালাল উপায়ে উপার্জন করে নিজের জীবন ধারণ করেছেন। তিনি এতিম ছিলেন, তিনি কারো কাছে হাত পেতে ভিক্ষা চাইতে পারতেন। কিন্তু নবীর চরিত্রের সাথে ভিক্ষা মানায় না। তিনি কখনো কারো কাছে আর্থিক সহায়তা চাননি। হ্যাঁ অভিভাবকের দায়িত্বের জায়গা থেকে যতদিন তার দাদা বেঁচেছিলেন ততদিন তার দায়িত্ব পালন করে গেছেন। তার ওফাতের পর চাচা আবু তালিব দায়িত্ব পালন করেছেন। কিন্তু আর্থিক দিক থেকে বড়ো ধরনের কোন সাপোর্ট পেয়েছেন এটা নবীজির জীবনে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়নি। এরপর তিনি আস্তে আস্তে বেড়ে উঠলেন। তার এই চারিত্রিক মাধুর্যতা, বিচক্ষণতা, তার সততা-আমানতদারি ও বুদ্ধিমত্তা এ সবগুলো বিবেচনায় নিয়ে খাদিজাতুল কোবরা (রা) তাকে ব্যবসায় ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। তার ব্যবসা আগেও ভালো ছিল।

রাসুল (সা) এর হাতে যখন ব্যবসার দায়িত্ব পড়লো, তখন আলহামদুলিল্লাহ! ব্যবসা দিন দিন আরও বৃদ্ধি পেতে থাকলো এবং হু হু করে এ ব্যবসার নাম, যশ-খ্যাতি বাড়তেই থাকলো। এর কারণ ছিলো তার সততা, সত্যনিষ্ঠতা, আমানতদারিতার সাথে তার কঠোর পরিশ্রম প্রিয়তা। তিনি তার নির্ধারিত বেতনের বাহিরে অতিরিক্ত কোন অর্থ গ্রহণ করেন-নি। এবং নির্ধারিত বেতন নিয়ে যথেষ্ট সন্তুষ্ট ছিলেন। যখন এরকমই ঘটলো তখন একটা পর্যায়ে খাদিজাতুল কুবরা (রা) তিনি দুই স্বামী হারিয়ে বিধবা ও বিপুল সম্পত্তির মালিক ছিলেন। তার একজন আশ্রয়ে একজন অভিভাবক প্রয়োজন ছিল। জীবনসঙ্গীর প্রয়োজন ছিল। তিনি নিজে থেকেই রাসুল (সা) কে প্রস্তাব দিয়েছেন, রাসুল করিম (সা) এর চরিত্রে আকৃষ্ট হয়ে। এটা তথাকথিত অবৈধ প্রেমের সম্পর্ক ছিল না বরং তার চারিত্রিক দৃঢ়তায় তাকেই মুগ্ধ করেছিলো এবং নিজ থেকে মুগ্ধ হয়ে তিনি এ প্রস্তাব অভিভাবকের মাধ্যমে পাঠিয়েছেন। যাতে তিনি তাকে সঙ্গী হিসেবে পেতে পারেন। আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ তায়ালা সেটা মঞ্জুর করেছেন। কবুল হয়েছে আল্লাহর দরবারে এবং পরবর্তী জীবনে তারা স্বামী-স্ত্রী হিসেবে কাটিয়েছেন। কি রকম স্বামী-স্ত্রী! যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন ততদিন আল্লাহ এবং আল্লাহর রসুলের উপর ঈমান এনে তিনি তার সমস্ত সম্পদ আল্লাহর পথে উৎসর্গ করে দিয়েছেন। শেষ জীবনটা তার দুঃখ কষ্টের দারিদ্রতায় কেটেছে। কিন্তু তাই নিয়ে যথেষ্ট সন্তুষ্ট ছিলেন। কারণ দুনিয়ার সবচেয়ে বড়ো নেয়ামত তিনি হাসিল করেছেন। সেই নেয়ামত ছিল মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ (সা)। তিনি তাকে নিয়েই তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন। আর মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ (সা) হযরত খাদিজাকে নিয়ে কেমন ছিলেন? যতদিন হযরত খাদিজা (রা) বেঁচে ছিলেন ততদিন পর্যন্ত তিনি দ্বিতীয় কোন বিবাহ করেননি। বিয়ে তার একটাই, সঙ্গী তার একজনই। এমনকি হযরত খাদিজাতুল কোবরা (রা) দুনিয়া ছেড়ে চলে যাওয়ার পর তার পরবর্তী বিয়ে শাদী হলো। বিবিদেরকে তিনি বলতেন তোমরা যখন তোমাদের ঘরে কিছু রান্না করো একটু ঝোল বাড়িয়ে দিও। খাদিজার বান্ধবীদের ঘরে তার একটু অংশ পাঠিয়ে দিব। আয়েশা (রা) রাসুল (সা) কে একদিন বলেন হে আল্লাহর রাসুল! তিনি তো বিধবা ছিলেন। তারপর আপনার সাথে বিয়ে হয়েছে। বয়সে আপনার বড়ো ছিলো। আমরা তো ছোট আমরা তো বেশি বেশি স্নেহ আশা করতে পারি। আমরা কুমারী ছিলাম, রসুলে করিম (সা) তাকে ধমক দিয়ে বলেছিলেন, কখনো খাদিজার সমান হতে চেষ্টা করবা না, পারবা না! পারবা না! কখনো পারবা না! খাদিজা আমার জীবনের কঠিন সময়ের সঙ্গী। তাছাড়া আল্লাহর দ্বীনের জন্য তার সবকিছু সে উজাড় করে দিয়েছে। তার সাথে নিজেকে মিলাও অসম্ভব এটা হবে না, কখনোই হবে না। আলহামদুলিল্লাহ! কোথায় থেকে হযরত খাদিজার প্রতি রসুলের মহব্বত পয়দা হয়েছিল। মহব্বত পয়দা হয়েছিলো একজন দায়িত্বশীল কর্মচারী হিসেবে। রাসুলে করিম (সা) কে যেভাবে তিনি পেয়েছিলেন তিনি তখন নিজের থেকেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ওনাকে কর্মচারীর মর্যাদায় রাখা শোভনীয় নয়। তার আরও কিছু দরকার, এটা তার প্রাপ্য, সেই প্রাপ্য থেকেই হযরত খাদিজা এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এখানে শ্রমিক এবং মালিক উভয়ের দায়িত্ব বোধের একটা চমৎকার একটি সম্মিলন গড়ে উঠেছে।

আমার সম্মানিত ভাইয়েরা, এই অঙ্গনে আমরা যারা কাজ করি আমরা

আমরা মালিকের পুঁজি ও মেধার সাথে শ্রমিকের শ্রমের সমন্বয় ঘটিয়ে উভয়ের মাঝে বন্ধুত্ব এবং ভালোবাসা দিয়ে ভ্রাতৃত্বের পরিবেশ সৃষ্টি করতে চাই। মালিক তার শ্রমিককে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবে শ্রমিক তার মালিককে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবে। এখানে একটি বন্ধুত্বের পরিবেশ তৈরি হবে। আমরা দেখি মাঝেমধ্যে শ্রমিকরা তাদের বকেয়া বেতন পাওয়ার জন্য রাস্তায় নামে। তারা কাজ বন্ধ করে মিছিল করে। তারা উত্তেজিত হয়ে মাঝে মধ্যে কিছু আক্রমণ করে বসে। এসব ক্ষেত্রে শ্রমিকদের দায়ী করা যায় না। কেননা সময়মত ন্যায্য পাওনা না পাওয়ার কারণে ক্ষুধার তাগিদে পেটে আগুন জ্বললে অনেক সময় মানুষের হুশ কাজ করে না। এখানে মালিকপক্ষ দায়ী। মালিকের জীবন চলতে যেমন অর্থের সংকলন প্রয়োজন হয় ঠিক একইভাবে শ্রমিকের ছোট্ট পরিবার চালাতেও অর্থের প্রয়োজন হয়। সে তো ভাই আপনার মত লাখ লাখ টাকা চাচ্ছে না। তার যে কয়টা হাতেগোনা টাকা আপনার কাছে পাবে সেটা কেন দিচ্ছেন না? এই অসন্তুষ্টির জায়গায় তৈরি হওয়া ইসলামের কোন সুযোগ নেই।

বলি যে আমরা এখানে শ্রেণি বিভক্ত তৈরি করতে চাই না। আমরা মালিকের পুঁজি ও মেধার সাথে শ্রমিকের শ্রমের সমন্বয় ঘটিয়ে উভয়ের মাঝে বন্ধুত্ব এবং ভালোবাসা দিয়ে ভ্রাতৃত্বের পরিবেশ সৃষ্টি করতে চাই। মালিক তার শ্রমিককে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবে শ্রমিক তার মালিককে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবে। এখানে একটি বন্ধুত্বের পরিবেশ তৈরি হবে। আমরা দেখি মাঝেমধ্যে শ্রমিকরা তাদের বকেয়া বেতন পাওয়ার জন্য রাস্তায় নামে। তারা কাজ বন্ধ করে মিছিল করে। তারা উত্তেজিত হয়ে মাঝে মধ্যে কিছু আক্রমণ করে বসে। এসব ক্ষেত্রে শ্রমিকদের দায়ী করা যায় না। কেননা সময়মত ন্যায্য পাওনা না পাওয়ার কারণে ক্ষুধার তাগিদে পেটে আগুন জ্বললে অনেক সময় মানুষের হুশ কাজ করে না। এখানে মালিকপক্ষ দায়ী। মালিকের জীবন চলতে যেমন অর্থের সংকলন প্রয়োজন হয় ঠিক একইভাবে শ্রমিকের ছোট্ট পরিবার চালাতেও অর্থের প্রয়োজন হয়। সে তো ভাই আপনার মত লাখ লাখ টাকা চাচ্ছে না। তার যে কয়টা হাতেগোনা টাকা আপনার কাছে পাবে সেটা কেন দিচ্ছেন না? এই অসন্তুষ্টির জায়গায় তৈরি হওয়া ইসলামের কোন সুযোগ নেই। কারণ রাসুল করিম (সা) এর স্পষ্ট কথা হচ্ছে শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকানোর আগে তাকে তার প্রাপ্য দিয়ে দাও। এই হাদিস এটা বোঝাচ্ছে না যিনি মাসিক ভিত্তিতে কাজ করছেন তাকে প্রতিদিনই তার ৮ ঘণ্টা দায়িত্ব পালনের পরে তার হাতে টাকা তুলে দিতে হবে।

সম্মানিত ভাইয়েরা, এখানে একটি জিনিস লক্ষণীয় আমরা ৮ ঘণ্টার কথা বলেছি কিন্তু অনেক সময় অনেক শ্রমিকরা আট ঘণ্টা কাজ করে তার সংসারের ঘানি কোনভাবেই তিনি টানতে পারেন না। তার চাহিদা পূর্ণ করতে পারেন না। ফলে তাকে ১৬-২০ ঘণ্টাও তাকে শ্রম বিনিময় করতে হয়। কিন্তু তিনি তো একজন মানুষ। মানুষের সর্বোচ্চ পরিধি বলে একটা কথা আছে। একটা সময়ই মানুষটা অল্প বয়সেই দুর্বল হয়ে পড়ে। বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে যায়। ফলে এই মানুষটা তার পরিবারের জন্য আরেকটা বোঝায় পরিণত হয় এবং এর জন্য সমাজ দায়ী। হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করার পরেও যদি মানুষটা পরিবার চালাতে না পারে কেমনে চলে? হ্যাঁ এখানেই রাষ্ট্রের দায়িত্ব। হতে পারে তিনি এমন একটা কর্মে নিয়োজিত আছেন যেখানে মালিক এর চাইতে বেশি দেওয়ার সামর্থ্য নেই। তাহলে উনার এটা দিয়ে চলে না আর ঐদিকে মালিকের সামর্থ্য নাই। এখানে সমাধান কি হবে? সমাধান হলো যে সমস্ত অর্থ বিত্তশালীরা, যে সমস্ত সামর্থ্যবান মানুষেরা এই শ্রমিকের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের তৈরি করা ঘরে বসবাস করতেছেন। রাস্তা যারা নির্মাণ করে, সেই শ্রমিকের ঘাম ঝরানো শক্তি উজাড় করে বিনিয়োগের মাধ্যমে যে ফিনফিনা রাস্তা তৈরি হয়েছে, যার উপর দিয়ে যারা হাঁটেন সরকার তাদের কাজ থেকে যথাযথভাবে যাকাত আদায় করবে, পর্যাপ্ত কর আদায় করবে। কর আদায়ে কারো প্রতি জুলুম করবে না আবার কাউকে ছাড়ও দিবে না। যাকাতের ব্যাপারেতো কোন কানাকড়ি ছাড় দেওয়ার কোন সুযোগ নেই। যখন ইনসাফ ভিত্তিকভাবে সামর্থ্যবানদের কাছ থেকে সেই টাকা আদায় করা হবে তখন সামর্থ্যবানরা আর বিদেশে টাকা পাচার করতে পারবে না এবং তাদের টাকা পাচার করার কোন প্রয়োজন হবে না। তখন দেশের টাকা দেশেই থাকবে। আর শ্রমিক তার উপযুক্ত পারিশ্রমিক পাওয়ার পরে যদি তার চাহিদা পূর্ণ না হয়, তখন রাষ্ট্র যে কর আদায় করবে সেখান থেকে শ্রমিকদের বিশেষ ভাতা দিবে। এখানে ত্রিপক্ষের দায়িত্ব। এখানে মালিক, শ্রমিক ও রাষ্ট্রের দায়িত্ব। এমন একটি রাষ্ট্র ইসলামী যুগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। যখন ঐ রাষ্ট্রে যাকাত নেওয়ার মতো কোনো লোক খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিলো না। তখন ব্যক্তিগতভাবে কোন মানুষকে যাকাত না দিয়ে তখন জনকল্যাণ ও রাষ্ট্রের কল্যাণে যাকাতের টাকা ব্যয় হয়েছে এবং তা দিয়ে দাওয়াতের কাজ সম্প্রসারিত হয়েছে অন্য দেশে।

সম্মানিত ভাইয়েরা, এরকম একটি রাষ্ট্রের নাগরিক যারা হতে পারেন তারা আসলেই সৌভাগ্যবান। তারা আসলেই গর্বিত। বাংলাদেশে আমরা এমন একটি সমাজ ব্যবস্থা চাচ্ছি। এমন একটাই শ্রমিকবান্ধব, মালিকবান্ধব পরিবেশ চাচ্ছি। এই যে এখন মালিকরা কর দেয় না ফাঁকি দেয়। এজন্য সরকার দায়ী। কিছু ক্ষেত্রে সরকার তার দায় অস্বীকার করতে পারবেন না। কিছু ক্ষেত্রে মালিকের লোভ, অসতর্কতা আর কিছু ক্ষেত্রে সরকারের লোভ এবং অসতর্কতা ও জুলুম দায়ী। রাষ্ট্র যখন ব্যক্তির উপর অতিরিক্ত করের বোঝা চাপিয়ে দেয় তখন ব্যক্তি অসাধু রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা-কর্মচারীর সাথে হাত মিলিয়ে অসৎ পথ অবলম্বন করে। এক্ষেত্রে রাষ্ট্র ক্ষতিগ্রস্ত হলেও ব্যক্তি ও অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারীরা কালো টাকার পাহাড় গড়ে তুলে। এটি তাদের জন্য বিষফোঁড়া। বিষফোঁড়া দেহের জন্য মানায় না। এটি দেহের অংশ হয়ে গেলেও দেহ এটাকে সহ্য করতে পারে না। দেহকে অনবরত কষ্ট দেয়। শেষ পর্যন্ত এটাকে কেটে ফেলতে হয়। অনেক সময় আর্থিক এই দুর্নীতির কারণে অনেক মানুষ জেলে যায়। কেউ দেশ ছাড়া হয়। কেউ সমাজে আত্মগোপন করে। এমনকি কেউ কেউ আত্মহত্যা করে। এ সবগুলো হলো ধ্বংসের পথ। এই ধ্বংস থেকে বেঁচে থাকার একমাত্র সমাধান হচ্ছে ইসলাম। ইসলামী শরিয়াকে যারা অনুসরণ করবে তাদের জীবনে, এ অভিশাপ আসার কোন সুযোগ নেই। কেউ থাকবে গাছ তলায় আর কেউ থাকবে পাঁচ তলায় এ সমাজে এটা হবে না। এ সমাজে নূন্যতম একটি ভারসাম্য থাকবে। এটা ঠিক যে সকলেই বড়ো বড়ো কোন প্রাসাদের মালিক হবে না। কিন্তু এটা ঠিক এ রাষ্ট্রের সকলেই ইজ্জতের সাথে বসবাস করার সুযোগ হবে। এক্ষেত্রে শ্রমিক ও মালিক স্ব স্ব দায়িত্ব পালন করবে এবং রাষ্ট্র মালিক-শ্রমিকের মাঝে সমন্বয় সাধন করে একটি কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করবে। শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন এরকম একটি পরিবেশ তৈরি করতে চায়। শ্রমিক ময়দানে একটি আদর্শিক পরিবেশ তৈরির অঙ্গীকার নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। কাজেই এই সংগঠনের কাজকে শুধু শ্রমিকদের মধ্যে নয়। এই সংগঠনকে মালিক পর্যন্ত পৌঁছাতে হবে। প্রমাণ করতে হবে ভাই আমি তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী, আমি তোমার ভালো চাই। আমি তোমার দুনিয়ায় ভালো চাই। আমি তোমার আখেরাতও ভালো চাই।

শ্রমিকরা যখন তার শ্রম নিয়োগ করবে তখন সে কাজে ফাঁকি দিবে না। এ ক্ষেত্রটা আছে বলেই তিনি চাকরি পেয়েছেন। যে প্রতিষ্ঠানে চাকরি করে তার জীবিকা নির্বাহ হয় সে প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি একজন শ্রমিক কোনভাবেই করতে পারে না। এখানে শ্রমিকেরও দায়িত্ববোধ থাকতে হবে। শ্রমিক মনে করবে আমার প্রতিষ্ঠান বেঁচে থাকলে আমি বেঁচে থাকবো। আমার প্রতিষ্ঠানের উন্নতি হলে আমার উন্নতির আশা বেঁচে থাকবে। কিন্তু প্রতিষ্ঠান যদি অধঃপতনের দিকে যায় তাহলে এ প্রতিষ্ঠান

আমার জন্য সহায়ক হবে না। অতএব শ্রমিক তার প্রতিষ্ঠানের কল্যাণ চাইবে আর মালিক হবে শ্রমিকদের কল্যাণ, আর রাষ্ট্র হবে উভয়ের দায়িত্বশীল এবং সমন্বয় করবে। এভাবে যদি আমরা শ্রমিক ময়দানে একটি পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারি আল্লাহর মেহেরবাণীতে ইনশাআল্লাহ আমরা শ্রমিকবান্ধব সহায়ক পরিবেশ পাবো। আমি বরাবর বলে থাকি এই ময়দানের ভাইদের কাজ হচ্ছে সদস্য বা কর্মী বৃদ্ধি করা নয়। এই ময়দানের ভাইদের কাজ হচ্ছে ইসলাম ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব শ্রমিক ময়দানে তুলে ধরা এবং প্রমাণ করা। এই জায়গাটা তুলে ধরতে হলে, প্রমাণ করতে হলে শ্রমিক ময়দানে সঠিক কাজের পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। এই পদ্ধতি হলো ট্রেড ইউনিয়ন। সেই ট্রেড ইউনিয়নের দিকে আমাদের মনোনিবেশ করতে হবে। আলহামদুলিল্লাহ, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এই জায়গাতে বেশ কিছু উন্নতি সাধিত হয়েছে। এক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখতে হবে ট্রেড ইউনিয়ন করতে গিয়ে তাড়াহুড়া করা যাবে না এবং অযোগ্য লোকদের হাতে ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃত্ব তুলে দেওয়া যাবে না। এই দুটি কাজ আমাদের দ্বারা হয়ে গেলে সময়ের ব্যবধানে ট্রেড ইউনিয়ন সম্পদ না হয়ে আমাদের জন্য আপদে পরিণত হবে। তখন আপনি যে কাজটাকে এগিয়ে নিতে চেয়েছিলেন সেটা আপনার জন্য প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে। আগে মানসম্মত লোক তৈরি করতে হবে। অতঃপর তার হাতে নেতৃত্ব তুলে দিতে হবে। যিনি সততা, দক্ষতা ও আমানতের সাথে দ্বীনের এই গুরুত্বপূর্ণ কাজের আঞ্জাম দিয়ে যাবেন। এর ব্যতয় ঘটলে এই জগতে ফিতনা তৈরি হবে। আমরা এগিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে আরও পিছিয়ে পড়বো। এই জন্য শুরু থেকে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।

শ্রমিক কল্যাণের নেতৃবৃন্দকে মালিকপক্ষের সাথে সৌহার্দমূলক সম্পর্কে পৌঁছাতে হবে। মালিকদের বিশ্বাস করাতে হবে এই সংগঠন কেবল শ্রমিকদের স্বার্থে কাজ করে না বরং মালিক-শ্রমিক উভয়ের স্বার্থে কাজ করে। তাহলে মালিকপক্ষ সকল ধান্দাবাজদের থেকে বাঁচার জন্য এই সংগঠনের উপর নির্ভরশীল হবে। আপনাদের বাছাই করবে কল-কারখানায় নেতৃত্ব দিতে। এর মাধ্যমে ফেডারেশনের কাজের জায়গা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। আপাতত আমি এই এরকম উন্নতি দেখতে পাইনি। অন্তত আমার কাছে এই রকম কাজ হয়েছে তার কোন রিপোর্ট নেই। আমি এক্ষেত্রে নজর দেওয়ার জন্য মূল দায়িত্বশীলদের দৃষ্টি দেওয়ার অনুরোধ করছি।

সংগঠন কতটুকু এগিয়ে যাবে আজকে এখানে যারা আছেন তাদের অঙ্গীকারের উপর নির্ভর করবে। তারা কিভাবে সংগঠনকে এগিয়ে নিতে চায়। এই মানুষগুলো যদি আল্লাহর জন্য নিজেকে উজাড় করে দিতে পারে তাহলে এ ময়দান কথা বলবে ইনশাআল্লাহ। এখন তার পরিবেশ তৈরি হয়ে গেছে। এবার আমাদের সাধারণ যে গণসংযোগ পক্ষ পালন হলো। আলহামদুলিল্লাহ! সারাদেশ থেকে আমরা যে সাড়া পাচ্ছি তা অতীতের যেকোন সময়ের তুলনায় অনেক ভালো। কোথাও কোন নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া পাইনি। বিভিন্ন সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ লোকেরা এখন আমাদের সংগঠনে শামিল হচ্ছেন। হয়তোবা তারা আস্থার একটা ঠিকানা খোঁজ করছেন এবং মনে করছেন, আমাদের পথ তাদের প্রত্যাশা পূরণ করবে। আল্লাহ তায়ালার কাছে দোয়া করি, মানুষগুলো যেন আরও বেশি আশাবাদী হতে পারে আমাদের আচরণ এবং কর্মে। এই ঠিকানায় এসে নতুন করে তারা হতাশাগ্রস্থ না হয়, হতাশ জেনো না হয়। আল্লাহ তায়ালা সেই দুর্বলতা থেকে আমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখুক। আমি শ্রমিক ময়দানে কাজ করা এই ভাইদেরকে বিশেষ অনুরোধ করবো। আপনারা দুটি জিনিস খেয়াল রেখে কাজ করবেন। প্রথমত হচ্ছে মূল সংগঠনের সাথে সবসময় ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রেখে কাজ করবেন। কোন তথ্যের গ্যাপ যেন না থাকে। মূল দায়িত্বশীলকে পর্যাপ্ত তথ্য দিবেন। তাহলে তার পক্ষে সম্ভাব্য সকল সহযোগিতা তিনি দিবেন অত্যন্ত স্বাচ্ছন্দে। এখানে যদি যোগাযোগের কিংবা সম্পর্কের কোন গ্যাপ থাকে তাহলে কাজ অগ্রসর করা যাবে না। দ্বিতীয়ত হচ্ছে আপনার জীবনের একটা ব্যক্তিগত পরিকল্পনা থাকবে। আপনি যে সেক্টরের যে বিভাগের সুযোগ পেয়েছেন কাজ করার, তদারকি করার, যেটিই আপনার দায়িত্ব। সেই দায়িত্বের জন্য সংগঠনের একটি প্লান আছে কিংবা আপনার একটি ব্যক্তিগত প্লান আছে। যে আপনি কোন মানুষটাকে কোথায় তৈরি করতে চান। সংগঠন বলে দিবে এ মানের এতজন মানুষ লাগবে এইমানের এতটা ইউনিট লাগবে কিন্তু মানুষটা কে হবে এটা তো সংগঠন বলে দিবে না এ পরিকল্পনা আপনার। আপনি কোন জায়গায় কোন মানুষটাকে তৈরি করতে চান তা আপনি ঠিক করবেন। মনে রাখবেন মানুষই সব কিছু মানুষের জন্য আল্লাহ সবকিছু, আল্লাহ তামাম জগতটাকে মানুষের কল্যাণের জন্য তৈরি করেছেন সুতরাং মানুষই হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই মানুষটা আপনাকে তৈরি করতে হবে।

তৃতীয়ত হচ্ছে যে কাজটাই করবেন এখলাসের সাথে করবেন, শুধু আল্লাহকে সন্তুষ্টির জন্য করবেন। কোন উর্ধ্বতন দায়িত্বশীলকে সন্তুষ্ট অসন্তুষ্ট কোন পরওয়া করবেন না। কাঙ্গাল হবেন না, কাঙ্গাল হবেন একমাত্র আল্লাহর জন্য। আমার সব কাজে আমি যেন আল্লাহকে খুশি করতে পারি। আমার আল্লাহ যদি অসন্তুষ্ট হন তাহলে আমার সব শেষ। এই তিনটা জিনিস বিবেচনা নিয়ে যদি আমাদের দায়িত্বশীল সহকর্মী বন্ধুগণ কাজ করেন আমি গভীর ভাবে বিশ্বাস করি যে আল্লাহ তায়ালা আমাদের বারাকাহ দিবেন। কল্যাণের একটি পরিবেশ সর্বক্ষেত্রে আমাদের সৃষ্টি করতে হবে। কল্যাণ মাথায় আসলে আমাদের বাজেটে চলে আসে। বাজেট কখনো সফলতার মাপকাঠি না। আপনি যদি লক্ষ্য স্থির করতে পারেন। বাজেট সব জায়গায় লাগে না। অধিকাংশ জায়গায় লাগে না। বিনা বাজেটেই মানুষের অনেক কল্যাণ হয়ে গেছে। আর বাজেট যেখানে লাগবে সেখানে সামর্থ্য অনুযায়ী করা হবে ইনশাআল্লাহ। কিন্তু প্রথমেই বাজেটের চিন্তা করলে কোনো কল্যাণের কাজ আপনি করতে পারবে না। এ সমস্ত বিষয়ে সামনে রেখে আল্লাহতালা প্রিয় এই সংগঠনকে আগামী দিনের প্রত্যাশার মঞ্জিল পর্যন্ত পৌঁছে নেওয়ার তাওফিক আমাদের দান করুন। আমীন।

(প্রবন্ধ শিরোনামে লেখা হলেও এটি মূলত একটি বক্তব্য। গত ১৭ জুন'২২ বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন আয়োজিত জেলা ও মহানগরী কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের শিক্ষা শিবিরে প্রধান অতিথি হিসেবে ফেডারেশনের প্রধান উপদেষ্টা ডাঃ শফিকুর রহমান উপরোক্ত বক্তব্য রাখেন)

শ্রমিক পরিবারের সন্তান: শিক্ষাজীবন ও শিশুশ্রম প্রসঙ্গ

ড. মাহফুজুর রহমান আখন্দ

সন্তান মানেই আদরের, ভালোবাসার। মালিক-শ্রমিক, ধনী-গরিব, বাদশাহ-ফকিরের হিসেব নিকেশ এখানে খাটে না। সব একাকার। মানব জীবনের প্রথম ধাপকে শিশুকাল বলে আখ্যায়িত করা হয়। এমনকি মায়ের গর্ভে অবস্থানরত সন্তানকেও শিশুরূপে পরিগণিত করা হয়ে থাকে। জীববিজ্ঞানের ভাষায় মানব সন্তানের জন্ম থেকে বয়ঃসন্ধির মধ্যবর্তী পর্যায়ের রূপ হচ্ছে শিশু। চিকিৎসা শাস্ত্র অনুযায়ী, মাতৃগর্ভের ভ্রূণ, অ-ভূমিষ্ঠ সন্তানই শিশু। যৌবনপ্রাপ্ত কিংবা বয়ঃসন্ধিক্ষণে প্রবেশ করেনি, এমন ব্যক্তিই শিশু বলে পরিচিত। মা-বাবার ভালোবাসা ও রক্ষণাবেক্ষণে বেড়ে ওঠে শিশু, হয়ে ওঠে সমাজ, দেশরক্ষার হাতিয়ার। অথচ সমাজে অনাথ শিশু, অবৈধশিশু, ছিন্নমূল-পথশিশু ইত্যাদি ভাগ্যাহত শিশু আমাদের চোখে পড়ে। জন্মের পর মা-বাবা হারানো সন্তানকে অনাথ বা এতিমশিশু, বিবাহ বহির্ভূত নর-নারীর সন্তান অবৈধ, ঠিকানা বিহীন রাস্তায় বেড়ে ওঠা শিশুরা ছিন্নমূল বা পথশিশু হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকে। এ সন্তানরা সমাজের সবচেয়ে ভাগ্যাহত মানবকুঁড়ি। অথচ আজকের শিশুই আগামী দিনের পরিপূর্ণ মানুষ, সমাজচিন্তক, সভ্যতার নির্মিতা।

শিশু অধিকার ও শিশুশ্রম

জাতিসংঘের সনদ এবং বাংলাদেশ সরকারের শিশুনীতি অনুযায়ী ০-১৮ বছর বয়স পর্যন্ত সকল মানবসন্তানকে শিশু বলা হয়েছে। এদেশের মোট জনসংখ্যার ৪৫ ভাগ শিশু, তন্মধ্যে ১৫ শতাংশ হচ্ছে সুবিধাবঞ্চিত শিশু। সুবিধাবঞ্চিত পথশিশুদের সংখ্যার সঠিক কোন জরিপ না থাকলেও, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার দেওয়া তথ্য অনুযায়ী বর্তমানে দশ লাখের অধিক পথশিশু আছ। যারা তাদের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত।

বিশ্বের প্রতিটি দেশেই শিশু অধিকার একটি মৌলিক অধিকার হিসেবে বিবেচিত। জাতিসংঘ সনদে শিশু অধিকার সংক্রান্ত নীতিমালা ঘোষণা করা হয়েছে। জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশও এই সনদে স্বাক্ষরকারী একটি দেশ। অধিকাংশ দেশেই অভিভাবকের দিকনির্দেশনায় কিংবা রাষ্ট্রের বাধ্যতামূলক শিক্ষানীতির আলোকে শিশুরা বিদ্যালয়ে গমন করে। ক্ষুদে শিশুরা খেলার ছলে শৈশবকালীন শিক্ষাকে আনন্দময় করে তোলে। কিন্তু অনুন্নতদেশে প্রায়শঃই শিশুদের জীবনযুদ্ধে অর্থ উপার্জনে শ্রমকার্যে অংশ নিতে হয়। বাংলাদেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে শিশুদের সার্বিক পরিস্থিতি ততটা উন্নত নয়। দারিদ্র্যের কষাঘাতে বহু শিশু বেঁচে থাকা, শারীরিক-মানসিক বিকাশ ও বিনোদনের অধিকার থেকে বঞ্চিত। অনেকক্ষেত্রে অভাবের তাড়নায় অভিভাবকরা তাদের শিশুদের ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োগ করেন। আবার ছিন্নমূল শিশুরা নিজেরাই ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নানা অপরাধেও জড়িয়ে পড়ে তারা। শিশুদের মাঝে মাদকাসক্তির চিত্র ভয়াবহ। শিশু অধিকার ফোরামের এক প্রতিবেদনে দেখা যায় ৮৫ ভাগ পথশিশু মাদকাসক্ত। ১৯ শতাংশ হেরোইন, ৪৪ শতাংশ শিশু ধূমপানে, ২৮ শতাংশ ট্যাবলেট, ৮ শতাংশ ইঞ্জেকশনে আসক্ত, ৮০ শতাংশ শিশু কাজ করে জীবন টিকিয়ে রাখতে; ২০ শতাংশ শারীরিকভাবে নির্যাতিত হয়; ৪৬ শতাংশ মেয়ে শিশু যৌন নির্যাতনের শিকার হয়; ১৪.৫ শতাংশ শিশু সার্বিকভাবে যৌন নির্যাতনের শিকার হয়। অভিভাবকহীন এ শিশুদের দিয়ে অনেকেই করাচ্ছে ভয়ংকর অপরাধ কর্মকাণ্ড। সামান্য কিছু টাকা বা দু'বেলা খাবারের জন্য চুরি, ছিনতাই, গাড়িতে আগুন, বোমা মারা, মাদক চোরাচালানসহ নানা রকম অপরাধকর্মে জড়িয়ে যাচ্ছে শিশুরা।

শিশুশ্রম একটি সামাজিক ব্যাধি। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা ও জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদে শিশুশ্রম বলতে বুঝানো হয়েছে– যখন কোনো শ্রম বা কর্ম পরিবেশ শিশুর দৈহিক, মানসিক, আত্মিক, নৈতিক ও

শিশু অধিকার ফোরামের এক প্রতিবেদনে দেখা যায় ৮৫ ভাগ পথশিশু মাদকাসক্ত। ১৯ শতাংশ হেরোইন, ৪৪ শতাংশ শিশু ধূমপানে, ২৮ শতাংশ ট্যাবলেট, ৮ শতাংশ ইঞ্জেকশনে আসক্ত, ৮০ শতাংশ শিশু কাজ করে জীবন টিকিয়ে রাখতে; ২০ শতাংশ শারীরিকভাবে নির্যাতিত হয়; ৪৬ শতাংশ মেয়ে শিশু যৌন নির্যাতনের শিকার হয়; ১৪.৫ শতাংশ শিশু সার্বিকভাবে যৌন নির্যাতনের শিকার হয়। অভিভাবকহীন এ শিশুদের দিয়ে অনেকেই করাচ্ছে ভয়ংকর অপরাধ কর্মকাণ্ড। সামান্য কিছু টাকা বা দু'বেলা খাবারের জন্য চুরি, ছিনতাই, গাড়িতে আগুন, বোমা মারা, মাদক চোরাচালানসহ নানা রকম অপরাধকর্মে জড়িয়ে যাচ্ছে শিশুরা।

সামাজিক বিকাশের ক্ষেত্রে বিপজ্জনক ও ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়, তখন তা শিশুশ্রম হিসেবে গণ্য হবে। বাংলাদেশ জাতীয় শ্রম আইন ২০০৬ অনুযায়ী ১৪ বছরের কম বয়সী শিশুদের কাজ করানো হলে তা শিশু শ্রমের অন্তর্ভুক্ত হবে।

বিশ্ব শ্রম সংস্থার তথ্য মতে, বিশ্বে ৫ থেকে ১৪ বছর বয়সী শিশুর সংখ্যা ১২০ মিলিয়ন। শিশুশ্রমের দিক থেকে বিশ্বের ১৪০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান দ্বিতীয়। আইএলও'র আরও এক সমীক্ষায় জানা যায়, বাংলাদেশে বর্তমানে ১৮ বছরের নিচে মোট শিশু শ্রমজীবীর সংখ্যা ৬৩ লাখ এবং এ সংখ্যা পৃথিবীর মোট শ্রমজীবী শিশুর ৫ শতাংশ। কৃষি ও শিল্পকারখানার কাজে নিয়োজিত রয়েছে ৬৫ শতাংশ শিশু। ৩০ শতাংশ শিশু পরিবারের সহায়তা দিতে কাজ করে থাকে। দূষিত কর্মপরিবেশে কাজ করে চলেছে ১৭ শতাংশ শিশু। বিশ্বে প্রায় সাড়ে ১১ কোটি শিশুশ্রমিকের অর্ধেকেরও বেশি খনির কাজ থেকে শুরু করে নির্মাণ, কৃষি ও শিল্প উৎপাদনের কাজে নিয়োজিত এবং ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুশ্রমিকের সংখ্যা অনেক বেশি। বিশ্বে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত মোট শিশুর ৫ দশমিক ৬ শতাংশই এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের দারিদ্র্যই মূলত শিশুশ্রমের জন্য দায়ী। কারখানার নানা ধরনের শ্রমের কাজ করানো হয় ৮ থেকে ১২ বছর বয়সের শিশুদের দিয়ে। বাংলাদেশে শতকরা ৯৪ ভাগ শিশুশ্রমিক কৃষি এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কাজ করছে। প্রায় ৪৭ লাখশিশু শ্রমিকের মধ্যে ৫ থেকে ১৪ বছরের শিশুর সংখ্যা বেশি।

বাংলাদেশ লেবার ফাউন্ডেশনের (বিএলএফ) পরিচালিত জরিপে বলা হয়েছে, শুধুমাত্র কেরানীগঞ্জেই সাড়ে নয় হাজার ছোট-বড়ো কারখানায় মোট শ্রমিক দুই লাখ ৩০ হাজার। এর মধ্যে ৪৭ শতাংশ শ্রমিকের বয়স ১৭ বছরের নিচে। এরমধ্যে পাঁচ থেকে ১৪ বছর বয়সী শিশুর সংখ্যা প্রায় ২০ হাজার এবং ৫-১৭ বছর বয়সী শিশুর সংখ্যা প্রায় এক লাখ ২০ হাজার। যেসব শিশু এসব প্রতিষ্ঠানে কাজ করে তারা বেশিরভাগই দরিদ্র পরিবারের। এদের মধ্যে আবার ৯০ শতাংশ ঢাকার বাইরে থেকে আসা। ফলে পরিবারের আয়ের জন্য শিশুদের কাজে পাঠাতে হয়। অন্যদিকে সমান কাজ করলেও শিশুদের বড়োদের মতো পারিশ্রমিক দিতে হয় না। এই সুযোগেও অনেকে শিশুদের কাজে নিয়োগ দিয়ে থাকেন। শিশুদের কাজের অনিরাপদ পরিবেশ, কাঠামোগত মজুরি নির্ধারণ না করা, কর্মঘণ্টা নির্ধারিত না থাকার বিষয়টি এখন ওপেন সিক্রেট। স্বাভাবিক মৌসুমে শিশুরা প্রতিদিন গড়ে ১৩ ঘণ্টা করে। আর মৌসুমের সময় কমপক্ষে ১৬ ঘণ্টা কাজ করে। এতে শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

'বাংলাদেশে শিশু শ্রমের অবস্থান' শীর্ষক এক সমীক্ষায় শিশুশ্রমের কারণ হিসেবে দেখানো হয়েছে দারিদ্র্য, পরিবারের উপার্জনক্ষম ব্যক্তি না থাকা, বাবা-মা পরিত্যাজ্যতা, অসচেতনতা, প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় অভিবাসন প্রভৃতি। অন্যদিকে পেটের জ্বালা, অভাব, লেখাপড়ার খরচ দিতে ব্যর্থ হওয়া এবং সংসারের অসচ্ছলতার গ্লানি একজন বাবা-মাকে তাদের শিশুসন্তানকে শ্রমে নিয়োজিত করতে বাধ্য করে। এছাড়া পিতৃ-মাতৃহীন অনাথ

শিশুরাই বহুলাংশে শিশুশ্রমের সঙ্গে যুক্ত। বাস, লঞ্চঘাট, হোটেল-মোটেল, ইটভাটা, মোটর গ্যারেজ, বাসাবাড়ী, কল-কারখানা, তামাক শিল্প, চামড়া শিল্প, স্টেশন বা টার্মিনালের কুলি, নির্মাণ শ্রমিক, চিংড়ি হ্যাচারি, লবণ কারখানা, দেশের নানা ধরনের ক্ষুদ্র ও মাঝারি ধরনের ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে ঝালাই, স্প্রে-পেইন্টিং, অটোমোবাইল গ্যারেজ, প্লাস্টিকদ্রব্য তৈরির কারখানায় কাজ করছে শিশুরা। শুধুমাত্র ঢাকা শহরেই দেড় লাখের বেশি শিশু বিপজ্জনক কর্মকাণ্ডে জড়িত। কিন্তু বাস্তবতা যে সম্পূর্ণ ভিন্ন তা বোঝার জন্য পরিসংখ্যানের প্রয়োজন নেই। আমাদের দেশে শিশুরা সাধারণত কৃষি, কলকারখানা, গণপরিবহন, আবাসন, খাবারের দোকান, বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ইটভাটা এবং নির্মাণকাজে কাজ করে। কোভিড-১৯ মহামারি চলাকালীন দরিদ্রতার কারণে শিশুশ্রম দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে।

শ্রমিক পরিবারের শিশুপ্রসঙ্গ

বাংলাদেশে খেটে খাওয়া মানুষের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি। শ্রমবিনিয়োগের মাধ্যমেই জীবন-জীবিকার চাকা ঘুরিয়ে চলেন বেশিরভাগ মানুষ। তাদের অনেকেই হ্যান্ড টু মাউথ। কারো কারো আর্থিক সমর্থ কিছুটা স্বচ্ছল হলেও পরিশ্রমের মাত্রা এতোটাই বেশি যে, পরিবারের সন্তানদের প্রতি খেয়াল রাখা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। জীবিকার সন্ধানেই মৌমাছির মতো ব্যস্ত সময় কাটাতে হয়। বর্তমান বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় সন্তানদের লেখাপড়ার পেছনে যে ধরনের বিনিয়োগ প্রয়োজন তা করার সুযোগ হয়ে ওঠে না। ফলে ভবিষ্যত প্রজন্মের এ সম্ভাবনাময় স্বপ্ন মুকুলেই ঝরে যায়।

শ্রম বাজার এখন দারুণ ভাবে অস্থিতিশীল হয়ে উঠেছে। শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনার নিয়েও নিরাপত্তার দেখা মেলে না। চাকরির গ্যারান্টিও নাই। ফলে শ্রমিকদের মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা খুব ভালো থাকে না। পুরুষদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা না থাকলে সংসারে অশান্তি সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি থাকে। এ কারণে দাম্পত্য কলহ অনেক বেশি সৃষ্টি হচ্ছে। এর প্রভাব পড়ছে তাদের সন্তানদের উপর। বিভিন্ন কারণে মা-বাবার মাঝে বিচ্ছেদের ঘটনা ঘটে, এতে শিশুর জন্য এ ভালবাসা হয়ে ওঠে অনিশ্চিত। বিচ্ছেদের পর বেড়ে উঠতে হয় মা কিংবা বাবার একক ভালবাসায়। অনেকক্ষেত্রে উভয়ের ভালবাসা থেকেই বঞ্চিত হতে হয় শিশুকে। এ ক্ষেত্রে পরিবারের সদস্য বা তৃতীয় পক্ষের দায়িত্বে বেড়ে উঠে শিশু। শিকার হয় লাঞ্ছনার। স্বজনহীন নির্দয় এক পরিবেশই হয়ে উঠে শিশুটির একমাত্র ঠিকানা। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী, ২০১৮ সালের তুলনায় ২০১৯ সালে ১৭ শতাংশ বিবাহবিচ্ছেদ বেড়েছে। ২০২০ সালে দুই সিটিতে ১২ হাজার ৫১৩টি ডিভোর্সের ঘটনা ঘটেছে। ২০২১ সালে জানুয়ারি থেকে এপ্রিল পর্যন্ত চার মাসে ৪ হাজার ৫৬৫টি বিচ্ছেদের আবেদন জমা পড়েছে (সূত্র- ২৬ জুন, ২০২১ কালের কণ্ঠ)। ব্যাপক হারে বিচ্ছেদের ঘটনায় অসহায় শিশুরা শারীরিক ও মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে। সমাজ ও রাষ্ট্রের দায়িত্ব কাউন্সিলিংয়ের মাধ্যমে বিবাহবিচ্ছেদ কমিয়ে আনা, যাতে শিশুরা তাদের জন্মগত অধিকার থেকে বঞ্চিত না হয়।

অকিাংশ শ্রমিক সামান্য বেতনে জীবন-জীবিকা নির্বাহ করেন। ফলে ছোটখাটো বাসাবাড়িতে একক ইউনিটে থাকতে হয়। অনেক সময় স্বামী-স্ত্রী দুজনকেই আয়ের পথ বেছে নিতে হয়। ফলে তাদের শিশুরা একাকিত্বের মাঝেই বেড়ে ওঠে। যৌথ পরিবারে কিছু সুবিধা থাকে, একক পরিবারে তা হয়ে উঠেনা। সঠিক যত্ন নেওয়া সম্ভব হয় না, সৃষ্টি হয় তাদের নানা শারীরিক ও মানসিক সমস্যা। অনেকক্ষেত্রে শিশুদের যৌন হয়রানিরও শিকার হতে হয়। কিছু কিছু পরিবার ডে-কেয়ার সেন্টারের সহায়তা নিয়ে থাকে। যৌথ পরিবারে শিশুর সমস্যায় সবাই এগিয়ে আসে। শিশুরা একাকীত্বে ভোগে না। লালন পালন সমস্যা হয় না। মানসিক স্বাস্থ্য ভালো থাকে। খেলাধুলার পরিবেশ থাকে। মিলেমিশে থাকার মানসিকতা তৈরি হয়। পাড়া-মহল্লায় খেলার মাঠগুলো ক্রমেই কমে আসছে। বিনোদন কেন্দ্র যা আছে, তাও অপ্রতুল। অথচ খেলাধুলার পরিবেশ ও বিনোদন কেন্দ্রগুলো শিশুর শারীরিক ও মানসিক গঠনের সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এ ধরনের সুযোগ থেকে শিশুরা বঞ্চিত হচ্ছে। ফলে তাদের বিকশিত হবার সুযোগ ক্রমশ সংকীর্ণ হয়ে উঠছে।

বাংলাদেশে দ্রুত গতিতে বেড়ে চলেছে নগরায়ন। দুর্যোগের পাশাপাশি কাজের সন্ধানে শহরে আসে গ্রামের মানুষ। আগামী ৩০ বছর পর মোট জনসংখ্যার অর্ধেকই বাস করবে শহরে। শহরমুখি এ জনস্রোত শ্রম বাজারকে অস্থিতিশীল করে তুলেছে। চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি করে তুলেছে জীবিন ও জীবিকার সহজ পথ।

শিশুদের মানবিক বিকাশ প্রয়াস

শিশুদের মানবিক বিকাশের জন্য বৈরী পরিবেশ আজ নতুন নয়। শিশুদের নিয়ে উদ্বিগ্ন বিশ্ববাসী। তাইতো বিশ্বব্যাপী নানামুখি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। শিশু অধিকার নিশ্চিত করতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে শিশু দিবস পালিত হয়ে আসছে। প্রথমবার ১৯২০ সালের ২৩ এপ্রিল তুরস্কে শিশু দিবস পালিত হয়েছিল। জাতিসংঘ ১৯৫৪ সালের ২০ নভেম্বর দিনটিকে শিশু দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। সেই থেকে বিভিন্ন দেশে ২০ নভেম্বরকে বিশ্ব শিশু দিবস হিসেবে উদযাপন করা হয়। আবার আন্তর্জাতিক শিশু দিবস জুন ১ তারিখে উদযাপন করা হয়। তবে বিভিন্ন দেশে নিজস্ব নির্দিষ্ট দিন আছে শিশু দিবসটিকে উদ্‌যাপন করার। বাংলাদেশে, ১৯৯৬ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন ১৭ মার্চকে শিশু দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবারকে বিশ্ব শিশু দিবস পালন করা হয়। শিশু দিবসগুলোতে শিশুদের অধিকার নিয়ে ব্যাপক আলোচনা ও নতুন নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়, বাস্তবায়নে কাজও করা হয়। তারপরও পরিপূর্ণ শিশু অধিকার বাস্তবায়ন হয় না বিশ্ব জুড়েই। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়।

জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) শিশুদের অধিকার রক্ষা এবং ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম দূর করার জন্য ২০০২ সাল থেকে 'বিশ্ব শিশুশ্রম বিরোধী দিবস' পালন করে আসছে। বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রতি বছর ১২ জুন এ দিবসটি পালন করা হয়। গত

দুই দশকে শিশুশ্রম কমানোর ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সত্ত্বেও, সাম্প্রতিক তথ্য দেখায় যে শিশুশ্রম নিরসনের বৈশ্বিক অগ্রগতি ২০১৬ সাল থেকে থমকে গেছে। কোভিড-১৯ মহামারি বিশ্বব্যাপী আরও লাখ লাখ শিশুকে শিশুশ্রমের ঝুঁকিতে ফেলেছে।

জাতিসংঘ ২০২৫ সালের মধ্যে শিশুশ্রম নির্মূল করার জন্য কিছু নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। এছাড়াও এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা ৮ দশমিক ৭ জোরপূর্বক শ্রম নির্মূল, আধুনিক দাসপ্রথা ও মানব পাচারের অবসান এবং নিকৃষ্টতম শিশুশ্রমের নিষেধাজ্ঞা ও নির্মূল করার জন্য অবিলম্বে এবং কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করার কথা বলেছে। এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা ১৬ দশমিক ২ শিশু শ্রমিকদের নিয়োগ ও ব্যবহার, শোষণ, পাচার এবং সকল প্রকার সহিংসতা ও নির্যাতনের অবসান ঘটানো এবং সকল প্রকার শিশুশ্রমের অবসান ঘটানোর কথা উল্লেখ করেছে।

ইউনিসেফ এর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে বাংলাদেশে সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা এখনো পর্যন্ত অতিমাত্রায় বিভক্ত। সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থায় রয়েছে ১৩০টি কর্মসূচি যেগুলো বেশির ভাগ ক্ষেত্রে একটির সাথে অপরটি সংযুক্ত নয়। এসব কর্মসূচির লক্ষ্যসমূহ একটির সাথে অন্যটি মিলে যায়, এতে বাজেট কম এবং এদের আওতাও অপ্রতুল। তবে ২০১৩ সালে কার্যকর হওয়া শিশু আইন, বাংলাদেশের সব জেলায় শিশু আদালত গঠনের বিধান রেখে সংসদে শিশু আইন সংশোধন বিল ২০১৮ পাস হয়েছে। দায়রা আদালতে যেসব ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্যাবলী সম্পাদন করতে পারে, আইন সংশোধনের ফলে শিশু আদালতও সে ক্ষমতার অধিকারী হলো। শিশুদের কল্যাণ, সুরক্ষা ও অধিকার নিশ্চিত করে তাদের জাতি গঠনের উপযোগী করে গড়ে তোলার এটা একটা ভালো প্রয়াস বলে মনে হয়েছে।

বর্তমান আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে শিশুশ্রম বন্ধ করা একটি কঠিন কাজ। প্রতি বছর ১২ জুন ঘটা করে শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস পালিত হলেও এখনো শিশুদের ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে বিরত রাখা সম্ভব হয়নি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পেটের জ্বালা মেটানোর জন্যই তারা কাজে নামে। অভাব না আইন দিয়ে আটকানো যায়, আর না উপদেশ দিয়ে। দরিদ্র শিশুদের অভিভাবকদের কাজের ব্যবস্থা করা; এক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ব্যবসার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে হবে। অন্যজনের শিশুকে নিজের সন্তান মনে করা, বেশি বেশি করে তদারকির ব্যবস্থা করা, কোথায় শিশুশ্রম হচ্ছে তা খুঁজে বের করা, শিশুদের দিয়ে কাজ করায় এমন মালিকের আইনের আওতায় এনে শাস্তির ব্যবস্থা করা, সর্বোপরি শিশুশ্রম নিরসনে যেসব আইন আছে, তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে শিশুশ্রম নামক অভিশাপ দূর করা সম্ভব হবে বলে মনে হয়। সরকার ঘোষিত বিপজ্জনক শিশুশ্রম তালিকায় স্থানীয় পোশাক কারাখানার শিশু শ্রমিকদের অন্তর্ভুক্ত করা, শিশুদের স্কিল ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা, শিশুর অভিভাবকদের সরকারের সহায়তা কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা, এসব কারখানাকে ক্ষুদ্র শিল্প হিসেবে গণ্য করা। সেইসাথে কারখানায় ঝুঁকিপূর্ণ কাজে শিশুদের নিয়োগদানের ওপর আরওপিত নিষেধাজ্ঞা কঠোরভাবে কার্যকর এবং গৃহকর্মে নিয়োগ ও ভাঙ্গারী খাতকেও ঝুঁকিপূর্ণ কাজের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা দরকার। শিশুশ্রম প্রতিরোধ কার্যক্রমকে সফল করে তুলতে অবিলম্বে শিশুনীতি বাস্তবায়ন, আইএলও কনভেনশন ১৮২ পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন ও ১৩৮ অনুসমর্থন করাসহ পথশিশু, ছিন্নমূল শিশু ও শিশু শ্রমিকদের পুনর্বাসন ও কল্যাণে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। কলকারখানার বিকাশ, উৎপাদন বৃদ্ধি ও ব্যাপক কর্মসংস্থানের প্রসার ছাড়া দারিদ্র্য-বিমোচন সম্ভব নয়। আবার দারিদ্র্য নির্মূল করা ছাড়া শিশুশ্রমও বন্ধ করা যাবে না।

পরিশেষে বলা যায়, সবার জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত এখনও সম্ভব হয়নি। স্যানিটেশন ব্যাবস্থার অনেক উন্নতি সত্ত্বেও, সুরক্ষিত টয়লেট ও হাত ধোয়ার সুবিধা পাচ্ছে না অনেকেই। এর সাথে আছে পুষ্টি, শিক্ষা, খেলাধুলা এবং শিশুর শারীরিক ও মানসিক নিরাপত্তা। প্রশিক্ষণের অভাবে শিশুদের মধ্যে প্রতিবন্ধিতা শনাক্ত করা সম্ভব হয়ে ওঠেনা। বাংলাদেশের বেশিরভাগ স্কুলে কিশোরি ও প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য টয়লেট সুবিধা নেই। মেয়ে শিশুরা নিরাপত্তা এবং যৌন হয়রানির কারণে মাঝেমাঝে পড়ালেখা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। বিকল্প শিক্ষা ব্যবস্থায় রয়েছে অনেক ঘাটতি। শিশুদের সামাজিক সুরক্ষায় প্রয়োজন জরুরি বিনিয়োগ। এর আওতায় আনতে হবে প্রতিবন্ধী শিশুদের। শিশু অধিকার সনদ ও আন্তর্জাতিক চুক্তির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আইনী কাঠামো এবং বিশেষ শিশু নীতি গ্রহণ ও দেশের সকল শিশু, বিশেষ করে দুস্থ শিশুদের কল্যাণ সাধন করা। পাশাপাশি প্রকল্প এলাকায় নারী ও শিশুদের প্রতি সহিংসতা, নির্যাতন এবং শোষণ প্রতিরোধকল্পে ইতিবাচক ও সহায়ক সামাজিক আদর্শের অনুশীলন, উন্নয়ন ও সদৃঢ় করাও প্রকল্পটির অন্যতম প্রধান কাম্য। শিশুশ্রম বন্ধে প্রতিটি জেলা পর্যায় ১৪ বছরের কম শিশুদের সমস্যা চিহ্নিত করে সেগুলোর সমাধান করতে হবে। শ্রমজীবী প্রতিটি শিশুর শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। শিশু শ্রম ও অধিকার সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। শ্রমিকদের সন্তানরা যাতে শিক্ষার পূর্ণ সুযোগ পায় সে বিষয়টি মালিকপক্ষকে নিশ্চিত করতে হবে। এর বাইরে মজুরি বৃদ্ধি, স্বাস্থ্যবিষয়ে সচেতনতা এবং শ্রমিকদের মন থেকে কুসংস্কার দূর করা ইত্যাদি বিষয়ে মালিক পক্ষের নজর দিতে হবে। শিশুর পরিবারের পক্ষ থেকেও সচেতনতা আরও বাড়াতে হবে। ধর্মীয় অনুশাসনই শিশুদের মুল্যবোধের পথে পরিচালিত করতে পারে। মাদকসহ অনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে শিশুরা যাতে জড়িয়ে না যায় সেজন্য তাদের ধর্মীয় বিধানের প্রতি মনোযোগী করাতে হবে। তাদের বন্ধু নির্বাচনের প্রতিও খেয়াল রাখতে হবে। সেইসাথে শিশুশ্রম নির্মূলে সামাজিক উদ্যোগ ও সচেতনতা বৃদ্ধির আন্দোলন আরও জোরদার করা প্রয়োজন।

লেখক: কবি ও গবেষক; প্রফেসর, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

আদর্শ পরিবার গঠনে আল্লাহর রাসুল (সা) কতিপয় উসওয়াহ

আব্দুদ্দাইয়ান মুহাম্মদ ইউনুছ

আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন আদর্শ পরিবার গঠন

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। এতে অর্থনীতি-রাজনীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, ব্যবসানীতি সব কিছুই রয়েছে। ইসলামে পারিবারিক জীবনের যেমনি দিক নির্দেশনা রয়েছে তেমনি রাষ্ট্র পরিচালনার গাইড লাইনও আছে, তবে ইসলামী রাষ্ট্র ও ইসলামী সমাজ উপহার দেওয়া সহজেই সম্ভব নয়। এর জন্য নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করতে হবে। কিন্তু মুসলমানরা ইসলাম অনুসরণ করেই পরিবার পরিচালনা করলে মডেল জীবন উপহার দেওয়া সম্ভব। কিন্তু দুঃখজনক সত্য যে, অনেক মুসলিম পরিবারেও অশান্তি বিরাজমান, অনেক মুসলিম পরিবারও কলহ-বিবাদ লেগে থাকে, মুসলিম পরিবারগুলোতেও ডিভোর্স এর সংখ্যা বাড়ছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানোর ক্ষেত্রে শয়তানের কূট কৌশল সফল হচ্ছে। হযরত জাবের থেকে বর্ণিত আছে যে রাসুলুল্লাহ (সা) এরশাদ করেন ইবলিশ শয়তান তার আসন পানিতে স্থাপন করে এবং সেখান থেকে তাঁর কর্মীদেরকে প্রেরণ করে মানুষকে পথভ্রষ্ট করার উদ্দেশ্যে। তার ছোট ছোট শয়তানরাও পৃথিবীতে বড়ো বড়ো গোমরাহী সৃষ্টি করে থাকে। অতপর তারা যখন মানুষকে গোমরাহ করে ফিরে আসে তখন প্রত্যেকেই নিজ নিজ কার্যবিবরণী পেশ করতে থাকে। একজন বলে, আমি আজ অমুক খারাপ কাজ করিয়ে এসেছি। ইবলিশ তখন বলে এটা তোমার তেমন উল্লেখযোগ্য কাজ হয়নি। এরপর অন্যান্য শয়তান তাদের কার্যবিবরণী গর্বের সাথে পেশ করে। অবশেষে এক শয়তান এসে বলে যে আমি আজ এক মহৎ কাজ করে এসেছি, এক ব্যক্তি এবং তার স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে এসেছি। ইবলিস এই বিবরণ শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে তাকে কাছে টেনে নেয় এবং বলতে থাকে তুমি আজ সত্যি একটি বড় কাজ করে এসেছো।

ইসলামে পারিবারিক জীবনের লক্ষ্য শান্তি ও ভালবাসাপূর্ণ মায়ামমতার বন্ধন

ইসলামী পারিবারিক জীবনের অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে সাকীনাহ; মুয়াদ্দাহ ও রাহমাহ অর্থাৎ শান্তি, ভালবাসা ও মায়ামমতার বন্ধন। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলেন, তাঁর নিদর্শনের মধ্যে হল এই যে, তিনি তোমাদের মধ্য হতেই তোমাদের সঙ্গিনি সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা তার কাছে শান্তি লাভ করতে পারো আর তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। এর মাঝে অবশ্যই বহু নিদর্শন আছে সেই সম্প্রদায়ের জন্য যারা চিন্তা করে। (সুরা রুম: ২১) মূলত পারিবারিক জীবনে শান্তি না থাকলে সমাজ জীবনে শান্তি আসেনা। সাইয়েদ কুতুব তাঁর বিশ্ব শান্তি ও ইসলাম বইতে যথার্থই বলেছেন, "বিশ্ব শান্তির জন্য প্রয়োজন পারিবারিক জীবনে শান্তি"। কিন্তু বর্তমানে পারিবারিক জীবনে অশান্তির দাবানল জ্বলছে। শুধু ইউরোপ কিংবা আমেরিকা নয় বরং মুসলিম দেশগুলোতেও বিবাহ বিচ্ছেদ আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। কিছুদিন আগে বিবাহবিডি ডট কম নামে একটি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে বিবাহ বিচ্ছেদের উপর একটি জরিপ করে। তাতে দেখা যায় বিভাগীয় শহরে বিচ্ছেদের হার ৪৯.৩ শতাংশ আর জেলা শহরে ৩৫.৫ শতাংশ। উচ্চশিক্ষিত আর শহরে অবস্থানরতদের বিবাহ বিচ্ছেদের হার বেশি। ২০২১ সালে নারায়ণগঞ্জে বিবাহ রেজিস্ট্রি হয়েছে ৮১৮৩ আর বিচ্ছেদ হয়েছে ৩১৪২। সেই হিসাবে প্রতিদিন আটটি বিবাহ বিচ্ছেদ হয়েছে। ২০১৮ সালের এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় সৌদী আরবে গড়ে প্রতি ঘণ্টায় সাতজন নারীকে তালাক দেয়া হয়। সৌদী আরবে বিবাহের ৩৫% তালাক হয়ে যাচ্ছে; যা আশঙ্কাজনক। পারিবারিক অশান্তিসহ বিভিন্ন কারণে বাংলাদেশে প্রতিবছর প্রায় দশ হাজার নারী-পুরুষ আত্মহত্যা করে মারা যায়। কিশোরী মেয়েরা যৌন নিপীড়নের শিকার হয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। কারণ মেয়েরা বেশি আবেগপ্রবণ হয়। অনেক সময়

তারা আবেগ সংবরণ করতে না পেরে আত্মহত্যা করে। এক সময় লোক লজ্জার ভয়ে কেউ সহজে ডিভোর্স দিতে চাইতো না। কিন্তু এখন ডিভোর্স অনেকটা মামুলী ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। সাম্প্রতিক এক পরিসংখ্যান অনুসারে বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য পুরুষের চেয়ে নারীরাই বেশি আবেদন করে ।

পারিবারিক জীবনে অশান্তির অনেক কারন রয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে: পরকীয়া বা পর নারীর প্রতি আসক্তি, ভুলবুঝাবুঝি, সাংসারিক দায়িত্ব পালনে অনীহা, সংগীকে অবমূল্যায়ন করা, মাদকাসক্তি, পুরুষত্বহীনতা, মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন, সন্দেহ, শ্বশুর বাড়ীর লোকদের দুর্ব্যবহার, বদমেজাজ, সন্তানধারণে অক্ষমতা, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আসক্তি, স্বামী-স্ত্রী জীবন যাপনে অমিল, অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতা, নারীর পেশাগত উন্নয়নের নেশা, বিদেশে গিয়ে দেশে না ফেরা, দীর্ঘদিন স্বামী-স্ত্রী এক সাথে বসবাস করতে না পারা, যৌতুক, বাল্যবিবাহ, ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী না চলা, স্বামীর অবাধ্যতা ইত্যাদি। আবার কেউ কেউ ঘরের বাহিরে সময় দেন প্রচুর কিন্তু নিজ পরিবারে সময় দিতে পারেন না। তাই মাওলানা মওদুদী তাঁর হেদায়েত বইতে চমৎকারভাবে উল্লেখ করেছেন নিজের ঘর সামলান; কারণ অনেকেই আছেন অপরের ঘর নিয়ে ব্যস্ত কিন্তু নিজের ঘরের খবর নেই। নোমান আলী খানের মতে দারিদ্রতা, অর্থনৈতিক সমস্যা উম্মাহর মূল সমস্যা নয়, মূল সমস্যা হচ্ছে পারিবারিক বন্ধন ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।

মডেল পরিবারের জন্য আল্লাহর রাসুলই সর্বোত্তম উসওয়া

আদর্শ পারিবারিক জীবনই সমাজ ও সভ্যতা বিনির্মানের মূল ভিত্তি। পারিবারিক জীবনে অশান্তি থাকলে অঢেল সম্পদ থাকলেও মনে শান্তি আসেনা; রাতে ঘুম হয়না। দুঃখ, যাতনা নিয়েই দিনাতিপাত করতে হয়। আর পারিবারিক জীবনে শান্তি পেতে হলে আমাদেরকে আল্লাহর রাসুলের আদর্শ অনুসরণ করতে হবে।

আল্লাহর রাসুল (সা) ছিলেন স্বামী হিসাবে রোল মডেল। তাই হযরত সাফিয়্যা গর্ব করে বলতেন আমি আল্লাহর রাসুলের চেয়ে উত্তম আচরণের কোন মানুষ দেখিনাই। হযরত আয়েশা আল্লাহর রাসুলকে লক্ষ্য করে বলেন, কেন আমার মত একজন নারী আপনাকে নিয়ে সন্মানবোধ করবে না। আল্লাহর রাসুলের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই হযরত উমর বলতেন, একজন স্বামীর উচিত তার স্ত্রীর সাথে শিশুর মত খেলা করা। এই কারণেই জনৈক ব্যক্তি তার স্ত্রীর ব্যবহার সম্পর্কে উমর (রা) এর কাছে অভিযোগ দিতে এসে যখন উমরের স্ত্রীর ব্যবহার দেখেন তখন তিনি চলে যান। উমর (রা) তার চলে যাওয়ার কারণ জানতে চাইলে তিনি জবাব দেন আমি যেই জন্য এসেছি আমি দেখতে পেলাম আপনার অবস্থা আমার চেয়েও খারাপ। আমরা অনেক সময় আদর্শ পরিবার গঠন করার কথা বলি। কিন্তু ভুলে যাই আদর্শ পরিবার গঠন করতে হলে আমাদের পুরুষদেরকে আদর্শ স্বামী হতে হবে। আর নারীদেরকে হতে হবে আদর্শ স্ত্রী। তাহলেই আদর্শ পরিবার গঠন সম্ভব। আর সেই যুগলই হবে পরস্পরের জন্য চক্ষুশীতলকারী।

স্ত্রীদেরকে আল্লাহর রাসুল (সা) কখনও প্রহার করেননি বা তাদের অন্যায়ের কারণে কটু কথা বলেননি। একবার রাসুলে কারীম (সা)

স্ত্রীদেরকে আল্লাহর রাসুল কখনও প্রহার করেননি বা তাদের অন্যায়ের কারণে কটু কথা বলেননি। একবার রাসুলে কারীম (সা) হযরত আয়েশার ঘরে থাকার সময় হযরত সাফিয়্যা খাবার পাঠান। আয়েশা ঈর্ষাকাতর হয়ে খাবারসহ প্লেটটি ভেংগে ফেলেন। রাসুলে কারীম (সা) রাগ করলেননা। নিজ হাতে ভাংগা পাত্রের টুকরা কুড়াতে কুড়াতে ভৃত্যকে বললেন তোমাদের মায়ের ঈর্ষা এসে গেছে। তাঁর স্ত্রীরা রাগ করে তাঁর সাথে কখনও অভিমানে সারাদিন কথা বলতেননা। আবার একবার সকলে ভরণ পোষনের চাহিদা ব্যক্ত করেন। এতে আল্লাহর রাসুল অসন্তুষ্ট হয়ে একমাস কারো কাছে যাননি। অবশ্য এক পর্যায়ে তারা তাদের ভুল বুঝতে পারেন। রাসুলে কারীম (সা) কোন স্ত্রীর প্রতি অসন্তুষ্ট হলে তার সাথে কথা একটু কমিয়ে দিতেন। হাঁসি-কৌতুক কমিয়ে দিতেন। এতে তাঁরা তাদের ভুল বুঝতে পারতো এবং ক্ষমা চেয়ে নিতো।

হযরত আয়েশার ঘরে থাকার সময় হযরত সাফিয়্যা খাবার পাঠান। আয়েশা ঈর্ষাকাতর হয়ে খাবারসহ প্লেটটি ভেঙ্গে ফেলেন। রাসুলে কারীম (সা) রাগ করলেননা। নিজ হাতে ভাঙ্গা পাত্রের টুকরা কুড়াতে কুড়াতে ভৃত্যকে বললেন তোমাদের মায়ের ঈর্ষা এসে গেছে। তাঁর স্ত্রীরা রাগ করে তাঁর সাথে কখনও অভিমানে সারাদিন কথা বলতেন না। আবার একবার সকলে ভরণ পোষনের চাহিদা ব্যক্ত করেন। এতে আল্লাহর রাসুল অসন্তুষ্ট হয়ে একমাস কারো কাছে যাননি। অবশ্য এক পর্যায়ে তারা তাদের ভুল বুঝতে পারেন। রাসুলে কারীম (সা) কোন স্ত্রীর প্রতি অসন্তুষ্ট হলে তার সাথে কথা একটু কমিয়ে দিতেন। হাঁসি-কৌতুক কমিয়ে দিতেন। এতে তাঁরা তাদের ভুল বুঝতে পারতো এবং ক্ষমা চেয়ে নিতো। একবার রাসুলে কারীম তাঁর এক স্ত্রীর ঘরে মধু পান করার পর আয়েশাসহ অন্যরা একজোট হয়ে বলা শুরু করল আপনার মুখে মাগাফিরের দুর্গন্ধ। এতে আল্লাহর রাসুল মধু আর পান না করার অঙ্গীকার করেন। অবশ্য আল্লাহ তায়ালা তারপর অহী নাযিল করে জানিয়ে দেন আল্লাহ যা হালাল করেছেন তা নিজের উপর আপনি হারাম করতে পারেন না।

আল্লাহর রাসুলের জীবন থেকে তাঁর পারিবারিক জীবনের কয়েকটি চিত্র:

১.পরস্পরের জন্য দুআ করা ও সালাম দেওয়া: রাসুল (সা) বাহির থেকে ঘরে আসলে প্রথমেই সালাম করতেন। হযরত আয়েশা বলেন আমি আল্লাহর রাসুলকে কখনও আগে সালাম দিতে পারিনি। একবার আমি আল্লাহর রাসুল (সা) আসার আগে দরজার ভিতর লুকিয়ে ছিলাম তাঁকে আগে সালাম দিতে। কিন্তু তিনি ঘরের দরজা খোলার আগেই সালাম দেন।

রাসুলে কারীম (সা) বাহির হতে ঘরে ঢুকার আগে দুআ পড়তেন। কেননা দুআ না পড়লে অনেক সময় শয়তান সাথে সাথে ঘরে ঢুকে। একজন ব্যক্তি মাসনূন দুআ পড়ে সব কাজ করলে শয়তান সেক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করতে পারে না। একটি হাসিসে বর্ণিত আছে যে, দুআ পড়ে ঘরে প্রবেশ করলে শয়তান তার সংগী সাথীদেরকে ডেকে বলে এই ঘরে আজ তোমাদের থাকার জায়গা নেই এবং আহার নেই। আর দুআ না পড়ে ঘরে ঢুকলে শয়তান তার সঙ্গী সাথীদের ডেকে বলে তোমরা আস এই ঘরে তোমাদের থাকার জায়গা এবং খাবার রয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক যেন চক্ষুশীতলকারী হয় এই জন্য সব সময় আল্লাহর কাছে দুআ করতেন। কুরআনে আল্লাহ তায়ালা সেই দুআ শিখিয়ে দিয়েছেন।

২.একে অপরের সর্বোত্তম বন্ধু ও সাহায্যকারী হওয়া: আল্লাহর রাসুল (সা) ছিলেন তাঁর স্ত্রীদের সর্বোত্তম বন্ধু। হযরত খাদিজা (রা) এর সাথে আল্লাহর রাসুল (সা) বিভিন্ন বিষয় শেয়ার করতেন। আল্লাহর রাসুল (সা) এর উপর যখন প্রথম অহী নাযিল হয় আল্লাহর রাসুল (সা) ভীত সন্ত্রস্ত ছিলেন। হযরত খাদিজা (রা) তাঁকে সাহস যোগান। যখন অন্যরা তাঁর রিসালাতে বিশ্বাস করেনি; খাদিজা (রা) প্রথমেই দ্বিধাহীন চিত্তে ঈমান আনেন। ওয়ারাকা ইবন নওফেল এর কাছে নিয়ে যান। শেয়াবে আবু তালিবে যখন বন্দী ছিলেন; নানা ধরনের যুলম নির্যাতনের শিকার হন হযরত খাদিজা (রা) তাঁর সকল সহায় সম্পদ ও ভালবাসা উজাড় করে আল্লাহর রাসুলের পাশে ছিলেন।

৩. সময় দান ও শারীরিক হক আদায় : রাসুলে কারীম (সা) তাঁর স্ত্রীদের প্রতি সময় দিতেন এবং তাদের কথা ধৈর্য্যের সাথে শুনতেন। উম্মাহাতুল মুমিনীন সকলের জন্য পালাক্রমে সময় নির্দিষ্ট ছিল। সফরে যেতেও লটারীর মাধ্যমে একজন স্ত্রী সাথে নিতেন। তিনি তাঁর স্ত্রীদের কথা ধৈর্য্যের সাথে শুনতেন। একবার হযরত আয়েশা এক বিশাল গল্প বলা শুরু করেন। রাসুলে কারীম(সা) ধৈর্যের সাথে পুরো গল্প শুনেন এবং আয়েশাকে খুশী করার জন্য তার উপর মন্তব্যও করেন। একজন স্ত্রী সাধারনত চায় তার স্বামীর পক্ষ থেকে প্রচণ্ড ভালবাসা ও তার প্রতি মনোযোগ। তারকথা মনোযোগ দিয়ে শোনলে খুশী হয়। স্ত্রী সাধারণত স্বামীর কাছে সময় চায়। আর এই সময় ঘড়ির কাঁটা হিসাব করে দিলে হবে না। তার মন-মানসিকতা লক্ষ্য করেই সময় দিতে হবে।

আল্লাহর রাসুল রাতের বেলা স্ত্রীদেরকে নিয়ে ঘুরতে বের হতেন। হালকা গল্প করতেন। স্ত্রীর সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা করতেন। একবার তিনি পরাজিত হতেন আবার জিতে গিয়ে তার প্রতিশোধ নিতেন।

আল্লাহর রাসুল স্ত্রীদের সাথে শারীরিক হক আদায় করার ক্ষেত্রে মূল্যবান অনেক উপদেশ দিয়েছেন। যা ভালবাসাপুর্ণ পারিবারিক জীবনের জন্য অপরিহার্য। তিনি সাধারণত তাহাজ্জুদ নামাযের জন্য উঠার পর ফজর নামাযের আগে এই হক আদায় করতেন এবং মাঝে মধ্যে এক সাথে গোসল করতেন।

৪. পারিবারিক কাজে সহযোগিতা: রাসুল (সা) মাঝে মধ্যে ঘরের কাজে তথা রান্না-বান্নার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করতেন। রাসুলে কারীম (সা) মাঝে মধ্যে নিজে ছাগল যবেহ করে নিজেই রান্না করতেন এবং সকলকে দাওয়াত দিতেন। মহানবীর রান্না ছিল অত্যন্ত সুস্বাদু। তিনি ছাগলের দুধ ধৌত করতেন।

৫. হালাল বিনোদন: একবার হাবশিরা যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে খেলছিল। রাসুলে কারীম (সা) হযরত আয়েশাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দিলেন। তারপর রাসুলে কারীম (সা) আয়েশাকে খেলা দেখতে নিয়ে যান। হযরত আয়েশা (রা) আল্লাহর রাসুল (সা) এর কাঁধ ও কানের মধ্যে থুতলী রেখে তার পিছনে দাঁড়িয়ে খেলা দেখেন। আল্লাহর রাসুলের ওফাতের পর আয়েশা (রা) বলেন তাঁর উদ্দেশ্য খেলা দেখা ছিল না; মূলত তিনি আল্লাহর রাসুলের সংস্পর্শে থাকার জন্যই খেলা দেখার জন্য বের হতেন।

৬. স্ত্রীগণের সাথে আচার ব্যবহার ও তাঁদের অধিকারের বিষয়ে সমতা বজায় রাখা: যখন তিনি কোন সফর কিংবা যুদ্ধাভিযানে বের হতেন, তখন দুএকজন স্ত্রীকে সফর সঙ্গী করতেন। তিনি স্ত্রীগণের মাঝে লটারীর ব্যবস্থা করতেন। লটারীতে যার নাম আসত তাঁকেই নিজের সফর সঙ্গী করতেন। এ ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ (সা) বলতেন "হে আল্লাহ! এ হলো আমার অধিকারভুক্ত বিষয়ে আমার কাজ (বণ্টন)। তাই যা আপনার মালিকানাধীন এবং যার মালিক (ভালোবাসা) আমি নই- এমন বিষয়ে আপনি আমাকে ভৎসনা করবেন না।

৭. আর্থিক অস্বচ্ছলতার মাঝেও দান সদকা: দুনিয়ার চাকচিক্য, ভোগ-বিলাস কখনো আল্লাহর নবীকে স্পর্শ করতে পারেনি। তিনি নিজে যেমন সাধারণ জীবন-যাপন করতেন, তেমনি চাইতেন তাঁর পূত:পবিত্র স্ত্রীগণ তাঁর মতো সাধারণ জীবন-যাপন করেন। একদিন হযরত উম্মু সালামা একটি হার পরিধান করেন। হারটিতে স্বর্ণের কিছু মুতিদানা ছিল। নবীজি হারটি পরা পছন্দ করলেন না। এর প্রতি বিমুখতা প্রদর্শন করলেন। রাসুলুলল্লাহ (সা)-এর এ অবস্থা দেখে উম্মু সালামা গলা থেকে হারটি খুলে ফেলেন।

রাসুলুলল্লাহ্ (সা)-এর স্ত্রীদের অনেকে ছিলেন আরবের বিভিন্ন গোত্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের কন্যা সন্তান। রাসুল (সা)-এর সাথে বিয়ের আগে তাঁরা নিজেদের পিতা এবং পূর্ব স্বামীর ঘরে অত্যন্ত স্বচ্ছলভাবে জীবনযাপান করতেন। মাদানী জীবনের শুরু থেকে দীর্ঘ ছয় বছর তাঁরা নবী সংসারে অভাব অনটন ও মিতব্যয়িতার মধ্য দিয়ে কাটিয়ে দেন। সপ্তম হিজরীতে খাইবার বিজয়ের পর নবীগৃহে পূর্বের চেয়ে কিছুটা আর্থিক স্বচ্ছলতা ফিরে আসে। মাঝে মধ্যে রাসুলুলল্লাহ (সা) স্ত্রীদের জন্য বাৎসরিক বরাদ্দকৃত খাদ্য-খাবার থেকে অভাবীদেরকে দান করতেন। নবীপত্নীগণও রাসুল (সা)-এর সান্নিধ্যে এসে তাঁর রং-এ রঙিন হন। তাঁরাও অন্যদের অভাব অনটনকে নিজের উপর প্রাধান্য দিতেন। অসহায় অভাবী ও দরিদ্র লোকদেরকে দরাজ হস্তে দান করতেন। এসব কারণে তাঁদের জন্য বাৎসরিক বরাদ্দকৃত খেজুর ও যব বছর পূর্তির পূর্বেই ফুরিয়ে যেত ।

নবুওয়াত লাভের পর মক্কী এবং পরবর্তীকালে মাদানী জীবনের প্রথম দিকে রাসুলুল্লাহ (সা) -এর আয়ের কোন উৎস ছিল না। যাকাত-ফিতরা খাওয়া নবী ও তাঁর পরিবার-পরিজনের জন্য ছিল হারাম। তাই দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটানোর জন্য আনসারগণ কিছু খেজুরগাছ তোহফা হিসেবে নবী করীম (সা)-এর জন্য নির্দিষ্ট করে দেন। এছাড়া আনসারগণ বিভিন্ন সময়ে হাদিয়া হিসেবে যা কিছু পাঠাতেন তাই ছিল রাসুলুল্লাহ (সা) ও তাঁর পরিবারের খাদ্য-খাবার। আবার মাঝে মধ্যে রাসুলুল্লাহ (সা) অন্যের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করতেন। হযরত 'আয়িশা (রা) বলেন, রাসুল (সা)-এর মদীনায় আগমনের পর তাঁর পরিবার-পরিজন একাধারে তিনদিন গমের রুটি পরিতৃপ্ত হয়ে খান নি। আর এ অবস্থায় তিনি ইন্তেকাল করেছেন। তাঁর পরিবার দৈনিক দুবেলা খাবারের একবেলা খেজুর খেয়েই কাটিয়ে দিতেন। হযরত 'আয়িশা (রা) থেকে আরও বর্ণিত; তিনি উরওয়াকে বললেন, হে আমার বোনের ছেলে! আমরা দুমাসে তিনটি চাঁদ দেখতাম এবং আল্লাহর নবীর ঘরে আগুন জ্বলত না। উরওয়া বললেন, কিভাবে আপনারা জীবিকা নির্বাহ করতেন। তিনি বললেন, দু'টি কালো জিনিস- খেজুর ও পানি দ্বারা। তবে রাসুলুলাহ (সা)-এর কিছু আনসারী প্রতিবেশী ছিল, যাদের ছিল দুগ্ধবতী উটনী ও বকরী। তারা নবীজিকে সেগুলোর দুধ দিত। আমরা তাই পান করতাম।

হিজরী ১ম বর্ষে সালমান ফারসী (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি বলেন, দাস থাকা অবস্থায় একদিন আমি রাসুলুল্লাহ (সা)-এর নিকট এসে বলি, হে আল্লাহ্র রাসুল! এগুলো সদকার মাল। রাসুল (সা) তাঁর সাহাবীদেরকে খাওয়ার আদেশ করলেন, তাঁরা খেলেন কিন্তু তিনি খেলেন না। তারপর আরেকদিন আমি তাঁর নিকট কিছু খাবার নিয়ে এসে বলি, এ মালগুলো হাদিয়া। হাদিয়া হিসেবে আমি আপনাকে এগুলো দিয়েছি। এগুলো দিয়ে আপনাকে সম্মান করছি। আমিতো দেখলাম, আপনি সদকার মাল খান না। এবার রাসুলুল্লাহ (সা) তাঁর সাহাবীগণকে খাবার গ্রহণের নির্দেশ দিলেন এবং নিজেও তাঁদের সাথে খাবার খেলেন। (মুসনাদ)।

নবী পরিবারের মাঝে প্রাচুর্য ও আর্থিক স্বচ্ছলতা ছিল না। কিন্তু সেখানে ছিল পরম সুখ শান্তি ও স্বর্গীয় আবহের এক মনোরম পরিবেশ। হযরত উম্মু সালামা শৈশবকাল থেকে পিত্রালয় অতঃপর পূর্ব স্বামীর সংসারে আর্থিক স্বচ্ছলতার মাঝে জীবন অতিবাহিত করেন। আহলে বাইতের অন্তর্ভূক্ত হওয়ার পর তিনি আস্তে আস্তে এ পরিবেশে জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। স্বামী রাসুলুল্লাহ (সা)-এর সন্তুষ্টি কামনায় নিজ ভৃত্য সাফীনাকে এ শর্তে মুক্ত করে দেন যে রাসুলুল্লাহ (সা)-এর ইন্তেকাল পর্যন্ত সে তাঁর খেদমতে নিয়োজিত থাকবে।

'উম্মুল মুমিনীনগণ খায়বার যুদ্ধের পর নিজেদের আর্থিক অবস্থা ও জীবন যাত্রার মান বৃদ্ধির সুযোগ মনে করেন। তাই তাঁরা সকলে একজোট হয়ে রাসুল (সা)-এর কাছে নিজেদের ইচ্ছার কথাটি ব্যক্ত করেন। কিন্তু স্ত্রীদের দাবি দাওয়ার বিষয়টি রাসুলুল্লাহ্ (সা)-এর মনঃপুত হয় নি। এ প্রসঙ্গে জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, একবার আবু বকর (রা) নবী করীম (সা)-এর কাছে এসে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। তখন লোকজন তাঁর দরজায় উপবিষ্ট ছিল। নবীজি তাঁকে অনুমতি দিলেন না। কিছুক্ষণ পর উমার (রা) এসে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। কিন্তু তাঁকেও অনুমতি দেওয়া হলো না। অতপর নবীজি আবু বকর ও উমার (রা) দু'জনকেই অনুমতি দিলেন। তাঁরা ভিতরে প্রবেশ করে দেখেন যে তাঁর স্ত্রীগণ তাঁর চারদিকে বসে আছেন এবং তিনি কোন কথা বলছেন না। উমার (রা) বললেন, অবশ্যই আমি নবীজিকে কথা বলে হাসাব। উমার (রা) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসুল! যদি আপনি যায়িদের বেটি উমারের স্ত্রীকে দেখতেন। সে কিছুক্ষণ আগে আমার কাছে টাকা চেয়েছিল। আমি তাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছি। উমার (রা)-এর কথা শুনে রাসুল (সা) এমনভাবে হাসলেন যে, তাঁর মাড়ির দাঁত দেখা গেল। নবীজি উমার (রা) কে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি দেখতে পাচ্ছ, এঁরা আমার কাছে খরচপত্রের জন্য টাকা চাচ্ছে। এ কথা শুনে আবূ বকর (রা) উঠে গিয়ে মেয়ে 'আয়িশা (রা)কে মারতে গেলেন এবং উমার (রা) উঠে গেলেন মেয়ে হাফসার দিকে। তাঁরা উভয়ে বললেন যে, তোমরা রাসুল (সা)-এর কাছে এমন জিনিস চাচ্ছো যা তিনি দিতে পারছেননা।

উম্মুল মুমীনীনগণ প্রত্যেকেই রাসুলুল্লাহ (সা) কে অক্ষরে অক্ষরে অনুসরণ করেছেন। মন-প্রাণ উজাড় করে তাঁর মধুর ভালবাসায় নিজেদেরকে ধন্য করেছেন। দ্বীনের কোন বিষয়ে তাঁরা আল্লাহর নবীর কোন আদেশ-নির্দেশ কিংবা নিষেধমূলক কোন কাজ লঙ্ঘন করেন নি। তবে আমাদের এ কথা জানা উচিত যে, রাসুলুল্লাহ (সা) যেমন একজন রাসুল ছিলেন, তেমনি ছিলেন একজন স্বামী। নবীপত্নীগণ যেমন ছিলেন উম্মুল মুমিনীন, তেমনি ছিলেন নারী। তাই নারীদের স্বভাবজাত গুণ-এক সখীর প্রতি আরেক সখীর আত্মমর্যাদা ও ঈর্ষার বিষয়টি তাদের মাঝে লক্ষণীয় ছিল। স্বামী রাসুলুল্লাহ (সা) কর্তৃক নির্ধারিত অংশটুকু তারা কখনও অন্যকে দিতে চাইতেন না। প্রত্যেকেই ইচ্ছা করতেন স্বামীর সান্নিধ্যে তার অংশটুকু পূর্ণভাবে কাটাতে। তাঁরা যখন স্ব-স্ব দৃষ্টিতে তাদের পালানুক্রমিক অংশটুকু না পাওয়ার অভাব অনুভব করতেন, যখন রাসুলুল্লাহ (সা) তাদের একজনের সামনে অপরজনের প্রশংসামাখা কথা বলতেন, তখন বিষয়টি তাদের আত্মমর্যাদাবোধে আঘাত হানত এবং ঈর্ষার উদ্রেক হতো। কিন্তু পরক্ষণে যখন তারা নিজেদের ভুল বুঝতে পারতেন তখন স্বামী রাসুলুল্লাহ (সা)-এর নিকট অনুতপ্ত হয়ে নিজেদের ভুলের কথা অকপটে স্বীকার করতেন। তারপর এ বিষয়ে আল্লাহর নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করতেন। এরূপ করার ক্ষেত্রে তাদের

একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল স্বামীর ভালোবাসা লাভে নিজেরদেরকে ধন্য করা।

রাসুলুল্লাহ (সা) পালাক্রমে প্রত্যেক স্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করতেন, তাদের সান্নিধ্যে যেতেন। তাঁদের সাথে হাসি-কৌতুক করতেন। নিজের সাধ্যমত স্ত্রীদের অধিকারের বিষয়ে সদা-জাগ্রত থাকতেন। কিন্তু স্ত্রীদের পক্ষ থেকে নিজের উপর সাধ্যাতীত কোন প্রস্তাবকে তিনি মেনে নিতেন না। এরূপ ক্ষেত্রে নবীজির অবস্থা দেখে উম্মুল মুমিনীনগণ বুঝতে পারতেন যে রাসুলুল্লাহ (সা) তাদের উপর রাগান্বিত হয়েছেন। আস্তে আস্তে তাঁরাও স্বামীর উপর চাপিয়ে দেওয়া নিজেদের দাবী-দাওয়া উঠিয়ে নিতেন।

৮. স্বামী-স্ত্রীর মাঝে মধুর সম্পর্ক সৃষ্টির জন্য এক সাথে খাবার: আমাদেরকে সম্ভব হলে অন্তত দিনের যে কোন এক বেলা এক সাথে খাবারের সময় বের করা ভাল। আল্লাহর রাসুল এক সাথে খাবার গ্রহণ করতেন। এক সাথে খাবারের সময় রাসুলে কারীম (সা) মাঝে মধ্যে স্ত্রীর মুখে খাবার তুলে দিতেন। রাসুল (সা) বলেন, "স্ত্রীর মুখে খাবার তুলে দেওয়া সাদকার সওয়াব"। রাসুল (সা) একই সাথে পনাহার করতেন। হাদিসে উল্লেখ আছে যে , কখনও কখনও আল্লাহর রাসুল গ্লাসের সেই পাশ দিয়ে পানি পান করতেন যে পাশে হযরত আয়েশা পানি পান করেছেন। হযরত আয়েশা হাড্ডির যে পাশে কামড় দিতেন রাসুলে কারীম (সা) ঠিক সেই পাশেই কামড় দিয়ে খেতেন। ওফাতের আগে আল্লাহর রাসুল হযরত আয়েশার ব্যবহার করা মেসওয়াক ব্যবহার করেন। যার ফলে দুইজনের মুখের লালা এক হয়ে যায়। আর আয়েশার কোলে মাথা রেখে তিনি মহান রব তাঁর প্রিয় বন্ধুর কাছে চলে যান।

৯. আদর করে বিভিন্ন নামে ডাকা: রাসুলে কারীম (সা) হযরত আয়েশাকে আদর করে আয়েশা বা হুমাইরা ডাকতেন। তাই যারা স্ত্রীকে আদর করে ময়না পাখি, শান্তি, জান ইত্যাদি নামে ডাকেন তারা রাসুল কারীম (সা) এর সুন্নাহ অনুসরণ করার কারণে সাওয়াব পাবেন। স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের প্রতি ব্যবহৃত শব্দের কারণে একে অপরের কাছে আসে আবার ব্যবহৃত কথার কারণেই দূরত্ব সৃষ্টি হয়। স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের জন্য ব্যবহৃত শব্দ যত মধুর হবে সম্পর্ক ততই মধুর থাকবে। স্ত্রীকে বুঝতে দিতে হবে যে, আপনি তাকে ভালবাসেন। আর মাঝে মধ্যে তা বলতে হবে যদিও মনে হবে তা বারবার বলাতে কি ফায়দা। কিন্তু আমি তোমাকে ভালবাসি তা বলার মাঝে ম্যাজিক রয়েছে। একদিন হযরত আয়েশ (রা) রাসুলে কারীম (সা) এর কাছে জানতে চান আপনি আমাকে কী রুপ ভালবাসেন? রাসুলে কারীম (সা) জবাব দেন, তোমার প্রতি আমার ভালবাসা এমন শক্তিশালী বন্ধনের মত যা খুলবেনা। কিন্তু তারপর একদিন দুজনের মধ্যে একটু বিতর্ক হয়। তখন আয়েশা (রা) জানতে চান আপনার বন্ধন এখন কেমন। তখন আল্লাহর রাসুল হেঁসে জবাব দেন আগের মতই শক্তিশালী।

১০. প্রশংসা করা ও মিষ্টি হাসিতে বরণ: স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে মিষ্টি হাসি দিয়ে বরণ করা বা বিদায় দেওয়া। আল্লাহর রাসুল (সা) মিষ্টি হাসিতে কথা বলতেন। বিভিন্ন কাজের জন্য উম্মাহাতুল মুমীনদের প্রশংসা করতেন। তিনি উম্মাহাতুল মুমীনদের রান্নার প্রশংসা করতেন। তাই স্ত্রীর কাজের সমালোচনা নয় প্রশংসা করুন। সমালোচনা করে কারো হৃদয় জয় করা যায় না। ভালোবাসা ও প্রশংসা করেই স্ত্রীর মন জয় করতে হয়। আল্লাহর রাসুল (সা) কখনও রান্নার সমালোচনা করেননি। পক্ষান্তরে, যখন একজন স্ত্রী তার স্বামীর কাছ থেকে প্রশংসা ও সম্মান পান, মানসিকভাবে তিনি অনেকটা সতেজ হয়ে ওঠেন। স্বামীর জন্য কোনো কিছু করতেই তিনি আর দ্বিধা করেন না।

১১. স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিভিন্ন বিষয়ে সমঝোতা: স্বামী-স্ত্রীর মাঝে যখন বোঝাপড়া ভাল হয় তখন সম্পর্ক মধুর হয়। আল্লাহর রাসুল পারস্পরিক বোঝা পড়ার ক্ষেত্রে মডেল ছিলেন।

স্বামী-স্ত্রীর মাঝে তর্ক-বিতর্ক হলে নিজেরা সমাধান করা। প্রয়োজনে অভিভাবকদের সহযোগিতা নেওয়া। একবার রাসুলে কারীম (সা) এর সাথে মা আয়েশার তর্ক হয়। আল্লাহর রাসুল (সা) তখন বলেন হে আয়েশা তাহলে এই বিষয়ে মীমাংসা করার জন্য তোমার পিতা আবু বকরকে ডাকি। আয়েশা সন্মতি দিলে আবু বকরকে সংবাদ দেওয়া হয়। তিনি আসার পর রাসুলে কারীম (সা) আয়েশাকে বলেন আয়েশা আমাদের মাঝে কি হয়েছে তা কি তুমি বলবে না আমি বলব। আয়েশা বললেন আপনি বলেন , তবে যা ঘটেছে তা হুবহু বলবেন; সঠিক কথা বলবেন। আবু বকর আয়েশার কথার টোন শুনে রেগে গিয়ে বলেন হে আয়েশা তুমি আল্লাহর নবীকে হক কথা বলার কথা বলছ। তোমাকে এই সাহস দিল কে? আল্লাহর রাসুল (সা) কি কখনও নাহক কথা বলবেন? এই জন্য তিনি আয়েশাকে ধমক দেন । তিনি আবার মারতে উদ্যত হলে আল্লাহর রাসুল আবু বকর ও আয়েশার মাঝখানে দাঁড়ান। তারপর আবু বকর চলে যান। আবু বকর চলে যাওয়ার পর আল্লাহর রাসুল বলেন আয়েশা আমি তো তোমাকে তোমার পিতার মার খাওয়া থেকে বাঁচিয়ে দিলাম। এই কথা বলে দুই জনেই হাঁসেন। আবু বকর তখনও ঘরের বাইরে। তিনি উভয়ের মাঝে চমৎকার কথা-বার্তা শুনে আবার ঘরে আসলেন এবং বললেন ইয়া রাসুলাল্লাহ। আপনারা যেমনিভাবে আপনাদের ঝগড়ার সময় আমাকে ডাকেন অনুরুপভাবে আপনাদের মাঝে শান্তি ও মায়াবী পরিবেশের সময়ও ডাকবেন।

আল্লাহ তায়ালা স্বামী-স্ত্রী উভয়ের পরিবার থেকে সালিশ সাব্যস্ত করার কথা বলেছেন। কেননা শুরুতেই বিষয়টি পরিবারের বাইরে নিয়ে গেলে তিক্ততা সৃষ্টি হতে পারে।

১২. একে অপরকে কখনও চিন্তিত দেখলে সঙ্গ দেওয়া এবং কি কারণে চিন্তিত তার কারণ জানার চেষ্টা করা: একবার রাসুলে কারীম (সা) স্ত্রীদের নিয়ে সফরে বের হন। পথিমধ্যে হযরত সাফিয়্যার উটটি অসুস্থ হয়ে বসে পড়ল তখন হযরত সাফিয়্যা কেঁদে দিলেন। রাসুলে কারীম (সা) এসে নিজ মায়াবী হাতে সাফিয়্যার চোখের পানি মুছে দিলেন। বিদায় হজ্জের সময় তিনি লক্ষ্য করলেন হযরত আয়েশা কাঁদছেন। তিনি তাঁর কাছে আসার পর বুঝতে পারলেন তার মাসিক ঋতুস্রাব শুরু হয়েছে। রাসুলে কারীম (সা) আয়েশাকে সান্তনা দিয়ে বললেন সকল নারীদের জন্যই আল্লাহ এটা নির্ধারিত করে দিয়েছেন। হজে যা করা প্রয়োজন তুমি তার সবই কর শুধু তাওয়াফটা করবে না। আয়েশার মাসিকের সময়ও রাসুলে কারীম (সা) তাঁর কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে থাকতেন আর আয়েশা তাঁর মাথা আঁচড়িয়ে দিতেন। একবার রাসুলে কারীম (সা) হযরত মায়মুনার সাথে শুয়ে ছিলেন। এমতাবস্থায় হঠাৎ মায়মুনা (রা) এর মাসিক শুরু হলে তিনি দ্রুত উঠে সরে যান যাতে

আল্লাহর রাসুলের দেহে রক্তের দাগ না লাগে। রাসুলে কারীম (সা) তখন হযরত মায়মুনাকে আবার কাছে ডেকে আনেন এবং একই চাদরের নীচে শুয়ে থাকেন। অথচ ভারতে এখনও কিছু এলাকায় ঋতুস্রাবের সময় নারীকে শীতের মাঝেও গোয়াল ঘরে থাকতে হয়। রান্না ঘরে ঢোকার অনুমতি নেই। স্বামী-সন্তানদের থেকে আলাদা থাকতে হয়।

স্ত্রীরা অসুস্থ হলে রাসুলে কারীম (সা) নিজেই রুকিয়্যা করতেন। তাঁদের সেবা করতেন।

১৩. স্ত্রীর আত্মসন্মানবোধের প্রতি খেয়াল রাখা: বিদায় হজে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন, " তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সদয় হও। তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে পাঁজরের বাকা হাঁড় দিয়ে। একেবারে সোজা করতে চাইলে ভেঙ্গে যাবে"। মক্কার কোরাইশ নারীরা ছিল স্বামীর প্রতি অধিক অনুগত। আর মদীনার আনসার নারীরা ছিল একটু বিপ্লবী স্বভাবের। হিজরাতের পর কুরাইশ নারীরা আনসার নারীদের সাথে মেলামেশা করার কারণে তাদের মাঝেও আত্মসন্মানবোধ বেশি জাগ্রত হয়। এমতাবস্থায় আল্লাহর রাসুল (সা) সাহাবাদেরকে আনসার পুরুষদের মত ব্যবহার করতে বলেন।

১৪. আল্লাহর রাসুল তাঁর স্ত্রীদেরকে হাতে কলমে ইবাদত বন্দেগী শেখাতেন। রমযানের শেষ দশকে সকলকে শেষ রাতে ঘুম থেকে জাগিয়ে দিতেন। সকলকে আল্লাহর ইবাদত করতে বলতেন। ছোট ছোট গুনাহের ব্যাপারে সাবধান করে দিতেন। আবার স্ত্রীরা যেন ইবাদত বন্দেগীকে উগ্রপন্থায় চলে না যায় সেদিকেও খেয়াল রাখতেন। কারণ হযরত উম্মে সালমা মসজিদে নববীতে নিজেকে বেঁধে রাখতেন যেন রাতের বেলায় ইবাদতে ঘুম না আসে। তিনি তা করতে নিষেধ করেন।

১৫. পরামর্শ গ্রহণ: সমাজ জীবনে দেখা যায় কেউ নারীকে অপূর্ণ বিবেকবান বলে তার পরামর্শ-যুক্তি একেবারেই অগ্রাহ্য করে যায়। কেউ আবার নিজ স্ত্রীকে মাত্রাতিরিক্ত মর্যাদার আসনে স্থান দেয়। তার সকল যুক্তি পরামর্শ কোন প্রকার বাদ-বিচার না করে স্ত্রীর মনোরঞ্জনে নির্দ্বিধায় গ্রহণ করে। ফলে সে মনের দিক থেকে স্ত্রীর গোলামে পরিণত হয়। কিন্তু আমরা যদি আল্লাহর রাসুল (সা)-এর দাম্পত্য জীবনের দিকে তাকাই তবে দেখতে পাব যে তিনি তার স্ত্রীদের কাছ থেকে নানা বিষয়ে পরামর্শ নিতেন এবং তা যথার্থ হলে গ্রহণ করতেন। হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় হযরত উম্মু সালামা (রা) ছিলেন রাসুল (সা) এর সফরসঙ্গিনী। বাহ্যত হুদায়বিয়ার সন্ধি মুসলমানদের স্বার্থ বিরোধী হওয়ায় মুসলমানদের মাঝে বিষণ্নতার এক কালো মেঘ নেমে আসে। আল্লাহর নবী তাদেরকে সে স্থানে কুরবানি করে হালাল হয়ে যাবার নির্দেশ দিলেন। তিন-তিন বার তিনি তাঁদেরকে এ ব্যাপারে নির্দেশ দেন। কিন্তু সাহাবায়ে কিরামের মাঝে নির্দেশ পালনে কোন সাড়া পাওয়া গেল না। সন্ধির বাহ্যত ফলাফলে তাদেরকে এক প্রকারের নির্বাক অবস্থায় পেয়ে বসে। এ অবস্থায় আল্লাহর নবী হযরত উম্মু সালামার কাছে আসেন এবং সাহাবায়ে কিরামের অবস্থা খুলে বলে উম্মু সালামার কাছে পরামর্শ চান। উম্মে সালমা বললেন ইয়া রাসুলাল্লাহ আপনি আপনার কুরবানি করে নেন। দেখবেন তখন বাকীরাও আপনার অনুসরণ করবে। বাস্তবে তাই হলো। উম্মু সালামার পরামর্শ অনুযায়ী রাসুল (সা) উদ্ভূত সমস্যা সমাধানে সক্ষম হন। পারিবারিক জীবনে পরামর্শ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ তায়ালা আল-কুরআনে সন্তানের দুধ পানের সর্বোচ্চ সময়সীমা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তার আগে কখন তা বন্ধ করবে তা স্বামী-স্ত্রী পরামর্শক্রমে নির্ধারণ করার নির্দেশনা দিয়েছেন।

১৬. আল্লাহর রাসুল স্ত্রীদেরকে অযথা নিজের কাজ দিতেননা। নিজের কাপড় নিজে ধৌত করতেন। নিজেই সিলাই করতেন। নিজের জুতা নিজ হাতেই ঠিক করতেন। নিজে ছাগলের দুধ দহন করতেন।

১৭. তাঁর স্ত্রীরা কখন খুশি আর কখন অসন্তুষ্ট তা বুঝতেন। একবার তিনি হযরত আয়েশাকে বলেন আয়েশা তুমি কখন আমার উপর সন্তুষ্ট আর কখন অসন্তুষ্ট তা আমি জানি। আয়েশা অবাক হয়ে জানতে চাইলেন কিভাবে আপনি তা বুঝেন। রাসুলে কারীম (সা) বললেন তুমি যখন আমার উপর সন্তুষ্ট তখন আল্লাহর কাছে দুআ কর এই বলে মুহাম্মদের রবের কসম। আর যখন আমার উপর অসন্তুষ্ট হও তখন বল ইবরাহীমের রবের কসম। আয়েশা বললেন আমি সেই সময় মুখে আপনার নাম মুখে উচ্চারণ না করলেও হৃদয়ে সব সময় আপনি থাকেন।

১৮. স্ত্রীদের মনে কোন বাসনা লুকিয়ে থাকলে তা পূরণের চেষ্টা করতেন। হযরত আয়েশা (রা) মা হতে পারেননি। তাই তাঁর ছোট বোন আসমার ছেলে হলে তার নাম রাখেন আব্দুল্লাহ। সেই থেকে আল্লাহর রাসুল (সা) আয়েশাকে মাঝে মধ্যে ডাকতেন উম্মে আব্দুল্লাহ বলে।

১৯. রাসুলে কারীম (সা) স্মার্ট চলাফেরা করতেন। শরীরে কোন দুর্গন্ধ হতোনা। ঘন ঘন মেসওয়াক করতেন। সুগন্ধি লাগাতেন।

২০. রাসুলে কারীম (সা) স্ত্রীদের সাথে আনন্দঘন পরিবেশ উপভোগ করতেন এবং নিরপেক্ষ থাকতেন। একবার হযরত আয়েশা কৌতুক করে হযরত সাওদার গালে খাবার মাখিয়ে দেন। রাসুলে কারীম (সা) মুচকি হাসি দিয়ে সাওদাকে বলেন আয়েশার মুখে খাবার মেখে দিতে। হযরত যয়নব একবার আয়েশাকে কড়া কথা বলারপর আয়েশা তার জবাব দেন। তখন আল্লাহর রাসুল (সা) আয়েশার পক্ষ নেন। আবার আয়েশা যখন সাফিয়্যার খাটো অবয়ব নিয়ে কটাক্ষ করে কথা বলেন তখন সাফিয়্যার পক্ষাবলম্বন করে আয়েশাকে বলেন,

" তুমি এমন কথা বলেছো যা সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হলে সমুদ্রের পানি দুষিত হয়ে যেতো"। একদিন ঘরে এসে দেখলেন সাফিয়্যা কাঁদছেন। কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করার পর সাফিয়্যা (রা) জানান হাফসা (রা) তাকে ইয়াহুদীর মেয়ে বলছে। তখন তিনি সাফিয়্যাকে সান্তনা দিয়ে বলেন, তুমি বংশগতভাবে একজন নবীর (হযরত হারুনের) কন্যা, আরেকজন নবী (হযরত মুসা) তোমার চাচা, আরেকজন নবী তোমার স্বামী। কিভাবে হাফসা তোমার চেয়ে উত্তম হয়?

চলবে..................

লেখক: শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক ও গবেষক

অধীনস্তদের সাথে রাসুলুল্লাহ (সা) এর অনুপম আচরণ

এডভোকেট আতিকুর রহমান

বৈচিত্র্যময় এ পৃথিবীতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সকল মানুষকে সমান আর্থিক সামর্থ্য দিয়ে সৃষ্টি করেননি। কাউকে সম্পদশালী বানিয়েছেন আবার কাউকে করেছেন একদম নিঃস্ব। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ধনী-গরিবের বিভেদ এজন্য করেননি যে, ধনীরা তার সম্পদের অহংকার প্রদর্শন করবে আর দরিদ্রেরা এজন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের প্রতি অভিযোগের আঙ্গুল উঠাবে। মূলতঃ এটি হচ্ছে ধনীদের জন্য আল্লাহর নির্দেশ পালন ও মানুষের অধিকার আদায়ের পরীক্ষা আর গরীবের জন্য ধৈর্য্য ও সহ্য-সহিষ্ণুতার পরীক্ষা। মহান আল্লাহ বলেন, 'আর চোখ তুলেও তাকাবে না দুনিয়াবী জীবনের শান-শওকতের দিকে, যা আমি এদের মধ্য থেকে বিভিন্ন ধরনের লোকদেরকে দিয়ে রেখেছি। এসব তো আমি এদেরকে পরীক্ষার মুখোমুখি করার জন্য দিয়েছি এবং তোমার রবের দেওয়া হালাল রিযিকই উত্তম ও স্থায়ী। (সুরা ত্বাহাঃ ১৩১) আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আরও বলেন, 'তোমার রবের রহমত কি এরা বন্টন করে? দুনিয়ার জীবনে এদের মধ্যে জীবন-যাপনের উপায়-উপকরণ আমি বণ্টন করেছি এবং এদের মধ্যে কিছু লোককে অপর কিছু লোকের ওপর অনেক বেশি মর্যাদা দিয়েছি, যাতে এরা একে অপরের সেবা গ্রহণ করতে পারে। (সুরা যুখরুফঃ ৩১)

দুনিয়ার জীবনের সামগ্রিক কার্যক্রম সুন্দরভাবে সম্পাদন করতে হলে সব শ্রেণি পেশার মানুষের প্রয়োজন রয়েছে। পৃথিবীতে কোনো মানুষ এ দাবি করতে পারে না আমি সব দিক থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ফলে প্রত্যেক মানুষকেই অন্যের মুখাপেক্ষী থাকতে হয়। যার ফলশ্রুতিতে মালিক ও শ্রমিক শ্রেণির সৃষ্টি। শ্রমিককে যেমন তার আর্থিক অস্বচ্ছলতা দূর করার জন্য অন্যের অধীনে কাজ করতে হয় তেমনি সামর্থ্যবান মানুষদের নানামুখী প্রয়োজন ও কার্য সম্পাদনে শ্রমিকের মুখোমুখি হতে হয়।

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে অধীনস্ত শ্রমিকদের সঙ্গে মালিকের সম্পর্ক, আচার-আচরণ কি রকম হবে সে সম্পর্কে সুন্দর নীতিমালা পেশ করেছে। ইসলামের দৃষ্টিতে শ্রমিক ও মালিকের পারস্পরিক সম্পর্ক ভৃত্য-মনিবের সম্পর্ক নয়। ইসলামে শ্রমিক ও মালিকের সম্পর্ক ভ্রাতৃত্বের ও সাহায্যকারীর। নিজের পরম আত্মীয়ের মতোই অধীনস্ত শ্রমিক, চাকর-চাকরানীর সাথে আন্তরিকতাপূর্ণ আচরণ করা, পরিবারের সদস্যদের মতই তাদের আপ্যায়ন করা, শ্রমিকের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার প্রতিটি মুহূর্তের প্রতি মালিকের খেয়াল রাখা এবং তাদের সুবিধা-অসুবিধার কথা বিবেচনা করাকে ইসলাম মালিকের দায়িত্ব ও কর্তব্যের মধ্যে শামিল করেছে।

ইসলাম শ্রমিকদের ব্যাপারে মালিক ও নিয়োগকর্তাদের অত্যন্ত ন্যায়ভিত্তিক, সহানুভূতিপূর্ণ এবং সৌভ্রাতৃত্বমূলক সম্পর্ক বজায় রাখার তাগিদ দিয়েছে বার বার। শ্রমিক নির্যাতন নৈতিক, ধর্মীয় এবং মানবিক দৃষ্টিকোণ কোন অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য নয়। ইসলাম এ ব্যাপারে মানুষকে বারবার অত্যন্ত কঠোরভাবে সতর্ক করে দিয়েছে যেন প্রত্যেকে নিজ নিজ অধীনস্তদের সাথে ভালো ব্যবহার করে এবং তাদের উপর কোন প্রকার জুলুম-নির্যাতন না করে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মুমিনদের নির্দেশ দিয়েছেনঃ 'তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তাঁর সাথে আর কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করো না, পিতা-মাতার সাথে সৎ ও সদয় ব্যবহার করো, আত্মীয়-স্বজন, এতিম, দরিদ্র, নিকট প্রতিবেশী, দূরের প্রতিবেশী, ভ্রমনের সহযাত্রী, অসহায় মুসাফির এবং নিজের দাসদাসীর সাথে সদয় আচরণ করো। নিশ্চয় আল্লাহ দাম্ভিক, গর্বিত ব্যক্তিকে পছন্দ করেন না।' (সুরা নিসাঃ ৩৬)। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার প্রিয় নবীকে উদ্দেশ্য করে বলেন, "তোমার অনুসারী বিশ্বাসীদের প্রতি তুমি সদয় হও"।
(সুরা শুআরা : ২১৫) 'মুমিনদের জন্য তুমি তোমার বাহুকে অবনমিত রাখ' (সুরা হিজরঃ ৮৮) অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, " নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়পরায়নতা, সদাচরণ ও আত্মীয়- স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অসৎকাজ ও সীমালঙ্ঘন করা হতে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন; যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।"
(সুরা নাহলঃ ৯০)

রাসুল (সা) ছিলেন উত্তম চরিত্রের সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত। রাসুল (সা) প্রেরিত হয়েছিলেন হেদায়াতের আলোকবর্তিকা নিয়ে। এসেছিলেন একটি সুন্দর পৃথিবী গড়তে। ইসলামের এমন কোনো বিধি-বিধান নেই যা তিনি আমাদেরকে শিক্ষা দেননি। ছোট-বড়ো সব বিষয়ে পরম যত্ন ও ভালোবাসা দিয়ে শিক্ষা দিয়ে গেছেন। আল্লাহর রাসুল (সা) যা বলেছেন, তিনি নিজে ছিলেন তার সবচেয়ে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি নামাজের কথা বলেছেন আর তার নামাজ ছিল সবচেয়ে সুন্দর ও আকর্ষণীয়। তিনি রোযার কথা বলেছেন আর তার রোযা ছিল সবচেয়ে সুন্দর ও আমলে পরিপূর্ণ। তিনি হজের কথা বলেছেন তার হজই ছিল সবচেয়ে সুন্দর ও মর্যাদাপূর্ণ। তিনি দান সদকার কথা বলেছেন আর দান সাদাকার ক্ষেত্রে তিনিই ছিলেন সবচেয়ে অগ্রগামী। তিনি সুন্দর আচরণের কথা বলেছেন, তার আচরণই ছিল সবচেয়ে সুন্দর ও অনুকরণীয়। রাসুল (সা) এর জীবনের এ সকল বৈশিষ্ট্যের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় মহান আল্লাহর সাক্ষ্য এবং তাদের সাক্ষ্য যারা রাসুল (সা) এর একান্ত নিকটজন ছিলেন এবং রাসুল (সা) এর ভেতর বাহির যাদের সামনে স্পষ্ট ছিল। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার প্রিয় রাসুল (সা) সম্পকে পবিত্র কোরআনে বলেন, নিশ্চয় আপনি মহান চরিত্রের

অধিকারী। (সুরা আল-কলম: ০৪) উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা) কে জিজ্ঞাসা করা হল, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বভাব-চরিত্র কেমন ছিল? তিনি বললেন, 'তার চরিত্র ছিল কুরআন।' তিনি ছিলেন কুরআনের বাস্তব রূপ। হযরত আনাস (রা) কে তার মা রাসুলুল্লাহ (সা) এর কাছে এই বলে রেখে গিয়েছিলেন যে, এই আমার ছেলে। সে আপনার কাছে থাকুক। আপনার কাছে থেকে সে দ্বীন শিখবে। আর ছোটখাট কাজ করে দেবে। হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) বলেন, আল্লাহর রাসুল (সা) ছিলেন সবচেয়ে সুন্দর আখলাকের অধিকারী। আমি ১০ বছর নবী (সা) এর খিদমত করেছি। কিন্তু তিনি কখনো আমার প্রতি উঃ! শব্দটি করেননি। এ কথা জিজ্ঞেস করেননি, তুমি এ কাজ করলে এবং কেন করলে না?
(সহিহ বুখারি: ৬০৩৮)
রাসুল (সা) কে প্রেরণ করা হয়েছে মহান চরিত্র দিয়ে। কারও প্রতি তিনি কোনো বিদ্বেষ রাখতেন না। ভুল হলে পরম যত্নের সঙ্গে বুঝিয়ে দিতেন প্রিয় সাহাবিকে। এক হাদিসে এসেছে তিনি তার প্রিয় সাহাবি হজরত আনাস বিন মালিককে (রা) বলেছেন, 'হে আমার বৎস! তোমার পক্ষে যদি সম্ভব হয় তুমি সকাল-সন্ধ্যা এমন অবস্থায় অতিবাহিত করবে যে, তোমার অন্তরে কারও প্রতি বিদ্বেষ নেই, তাহলে তাই কর। কারণ এটি আমার সুন্নাহ। আর যে আমার সুন্নাহকে উজ্জীবিত করে সেই মূলত আমাকে ভালোবাসে। আর যে আমাকে ভালোবাসে সে আমার সঙ্গে জান্নাতে থাকবে।' (সহিহ তিরমিজি: ২৬৭৮)
অধীনস্তদের ব্যাপারে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট প্রত্যেক মানুষকেই জিজ্ঞাসিত হতে হবে। এ প্রসঙ্গে হযরত ইবন উমর (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ (সা) বলেছেন : তোমরা প্রত্যেকেই রাখাল বা রক্ষণাবেক্ষণকারী স্বরূপ এবং তোমাদের প্রত্যেককেই তার অধীনস্তদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে। শাসক তার লোকজনের রাখাল স্বরূপ, তাকে তার শাসিতদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। গৃহকর্তা তার গৃহবাসীর রাখাল স্বরূপ, তাকে তার গৃহবাসীদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে। দাস তার মনিবের সম্পদাদির রাখাল স্বরূপ, তাকে তা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। মনে রাখবে, তোমাদের প্রত্যেকেই (কোন না কোনভাবে) রাখাল স্বরূপ এবং তোমাদের প্রত্যেককেই তার অধীনস্তদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। (সহিহ বুখারি: ২৫৫৮) রাসুলুল্লাহ (সা) অধীনস্তদের নিজেদের ভাই হিসেবে উল্লেখ করে তাদের অধিকারের ব্যাপারে সতর্ক হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন এবং তাদের উপর অতিরিক্ত কাজের বোঝা চাপিয়ে দিতেও নিষেধ করেছেন।
অন্য হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে, মারূর ইবনু সুওয়াদা (রহ.) বলেন, একবার আমি আবুজর গিফারি (রা)-এর দেখা পেলাম। তার গায়ে তখন এক জোড়া কাপড় আর তার ক্রীতদাসের গায়েও (অনুরূপ) এক জোড়া কাপড় ছিল। তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, একবার এক ব্যক্তিকে আমি গালি দিয়েছিলাম। সে নবী (সা) এর কাছে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করল। তখন নবীজি (সা) আমাকে বললেন, তুমি তার মার প্রতি কটাক্ষ করে লজ্জা দিলে? তারপর তিনি বললেন তোমাদের গোলামেরা তোমাদেরই ভাই। আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের অধীনস্ত করেছেন, কাজেই কারও ভাই যদি তার অধীনে থাকে তবে সে যা খায়, তা হতে যেন তাকে খেতে দেয় এবং সে যা পরিধান করে, তা হতে যেন পরিধান করায় এবং তাদের সাধ্যাতীত কোনো কাজে বাধ্য না করে। তোমরা যদি তাদের শক্তির উর্ধ্বে কোনো কাজ তাদের দাও তবে তাদের সহযোগিতা কর। (সহিহ বুখারি: ৬০৫০)
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসুল

হযরত জাবের (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসুলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যার মাধ্যে তিনটি গুণের সমাবেশ হবে, আল্লাহ তার মৃত্যু সহজ করে দেবেন এবং তাকে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন। গুণ তিনটি হচ্ছে ১. দুর্বলের সাথে বিনয় ব্যবহার ২. মা-বাবার সাথে ভালোবাসা ও ৩. স্বীয় চাকর-চাকরানীর সাথে সদাচরণ। রাসুল (সা) ইন্তেকালের পূর্ব মুহুর্তেও অসুস্থাবস্থায় নামাজ এবং অধীনস্ত কর্মচারীদের সাথে সদয় আচরণের জন্য তাগিদ দিয়েছেন। হযরত আলী (রা) বলেন, নবী করীম (সা) এর অন্তীম কথা ছিল : নামাজ। নামাজ। তোমাদের মালিকানাধীন দাসদাসীদের সম্পর্কে আল্লাহকে ভয় করবে ।
(আল-আদাবুল মুফরাদ: ১৫৮)

(সা) ইরশাদ করেন, 'যে চায় তাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করা হোক এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হোক তার মৃত্যু যেন এমন অবস্থায় আসে যে, সে আল্লাহর প্রতি এবং শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখে। আর মানুষের সঙ্গে তেমন আচরণ করে যেমন আচরণ পেতে সে পছন্দ করে।' (সহিহ মুসলিম: ১৮৪৪)।

প্রিয় নবী (সা) এর অন্য এক বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, হযরত জায়েদ (রা) সারা জীবন রাসুল (সা) কাছে এমনভাবে ছিলেন মনে হতো যেন সে প্রিয় নবীর পুত্র। জায়েদ প্রিয় নবীর পুত্রের মতো আদর যত্নে বড় হয়েছেন। প্রাণঢালা স্নেহ পেয়েছেন প্রিয় নবীর কাছ থেকে। বড় হলে রাসুল (সা) জায়েদ কে আপন চাচাতো বোন জয়নবের সাথে বিয়ে দিলেন। পরিবারের একজন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় করে নিলেন জায়েদকে। জায়েদ ক্রীতদাস হিসেবে এসেছিলেন প্রিয় নবী (সা) এর সংসারে। কিন্তু একবারও মনে করলেন না সে কথা। প্রিয় নবী (সা) জায়েদের ছেলে উসামাকে খুব আদর করতেন। মনে হতো নাতি ইমাম হাসান ও হোসাইনের মতোই আপন।

আমাদের সমাজের অনেক মানুষদের দেখা যায় তারা তাদের অধীনস্ত চাকর-চাকরানীদের সাথে খারাপ ব্যবহার তো করেই সাথে সাথে তাদের বিভিন্নভাবে প্রহার করে, যা আদিম যুগের বর্বরতাকেও হার মানিয়ে দেয়। নুন থেকে চুন খসলেই সেবক ও অধীনস্তদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে, গায়ে হাত তুলে বসে। রাসুল (সা) কখনো অধীনস্তদের সাথে এ ধরণের আচরণ করেননি। রাসুল (সা) এর সহধর্মিনী আয়েশা (রা) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা) কখনো কোনো সেবককে এবং কোনো নারীকে মারধর করেননি। (আবু দাউদ: ৪৭৮৬) । হযরত আবু হোরায়রা (রা) বলেন, রাসুল (সা) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে স্বীয় চাকর-চাকরানীকে প্রহার করবে, কেয়ামতের দিন তাকে তার পরিণাম দেওয়া হবে। (বায়হাকি, শোয়াবুল ঈমান)। হযরত কাব ইবনে উজরা (রা) বলেন, নবী (সা) ইরশাদ করেন

' তোমাদের থালা-বাটি তোমাদের চাকর-চাকরানীর হাতে ভেঙ্গে গেলে তাদের মারধর করবে না। কেননা তোমাদের আয়ুষ্কাল যেমন নির্ধারিত থালা-বাটিরও তদ্রুপ'। (দায়লামি) আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা) বলেছেন, কেউ তার অধীনস্তকে অন্যায়ভাবে এক দোররা মারলেও কেয়ামতের বিচারের দিন তার থেকে বদলা নেওয়া হবে। (তাবরানী) হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা) বলেন : যে কেহ তাহার গোলামকে প্রহার করবে নির্যাতকরূপে তাহাকেই কেয়ামতের দিন শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা হবে।(আল-আদাবুল মুফরাদ: ১৮১)

হযরত জাবের (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসুলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যার মাধ্যে তিনটি গুণের সমাবেশ হবে, আল্লাহ তার মৃত্যু সহজ করে দেবেন এবং তাকে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন। গুণ তিনটি হচ্ছে

১. দুর্বলের সাথে বিনয় ব্যবহার ২. মা-বাবার সাথে ভালোবাসা ও ৩. স্বীয় চাকর-চাকরানীর সাথে সদাচরণ। রাসুল (সা) ইন্তেকালের পূর্ব মুহুর্তেও অসুস্থাবস্থায় নামাজ এবং অধীনস্ত কর্মচারীদের সাথে সদয় আচরণের জন্য তাগিদ দিয়েছেন। হযরত আলী (রা) বলেন, নবী করীম (সা) এর অন্তিম কথা ছিল নামাজ। নামাজ। তোমাদের মালিকানাধীন দাসদাসীদের সম্পর্কে আল্লাহকে ভয় করবে । (আল-আদাবুল মুফরাদ: ১৫৮)

অপর এক হাদিসে রাসুল (সা) বলেছেন, 'অধীনস্তদের সাথে সদয় আচরণ কল্যাণকর অদৃষ্টের উৎপত্তিস্থল আর তাদের সাথে দুর্ব্যবহার দুর্ভাগ্যের উৎপত্তিস্থল। মালিকপক্ষের অভদ্র আচরণকে ঘৃণা করে প্রিয়নবী (সা) আরও বলেন, " চাকর, দাস-দাসী ও 'অধীনদের সঙ্গে অসদাচরণকারী বেহেশতে যেতে পারবে না"। (তিরমিজি: ২৩৯৮)

রাসুল (সা) বলেছেন, 'ঐ ব্যক্তি প্রকৃত মুসলিম যার রসনা ও হাত থেকে অপর মুসলমান নিরাপদ থাকে। রাসুল (সা) আরও বলেছেন, 'কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে নিজের জন্যে যা চাইবে তা তার ভাইয়ের জন্যেও চাইবে। হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করিম (সা) বলেছেন, প্রত্যেকটি সৎ কাজই সাদকা। হযরত আবু মুসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, প্রত্যেক মুসলমানেরই সাদকা করা অবশ্য কর্তব্য। উপস্থিত লোকজন বলল, যদি সে সাদকা করার মত কিছু না পায়? তিনি বললেন, সে যেন কারো সাথে খারাপ ব্যবহার না করে। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করিম (সা) বলেন, ভাল কথা ও সাদকা করা উত্তম কাজ। নবী করিম (সা) আরও বলেন, তোমরা দোযখের আগুন থেকে বেঁচে থাক, একটি খেঁজুর দিয়ে হলেও। যদি তা না পাও তাহলে মধুর ভাষার বিনিময়ে। চাকর-চাকরানিকে ভরণপোষণের ব্যবস্থা করাকে রাসুল (সা) সাদাকা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। হযরত মিকদাম (রা) বলেন, তিনি নবী করীম (সা) কে বলতে শুনেছেন: তুমি তোমার নিজেকে যাহা খাওয়াও তাহা সাদাকা বিশেষ, তুমি তোমার স্ত্রী-পুত্র এবং ভৃত্যকে যাহা খাওয়াও, তাহা সাদাকা বিশেষ। (আল- আদাবুল মুফরাদ: ১৯৫)

রাসুলুল্লাহ (সা) অধীনস্ত শ্রমিক কর্মচারীদের আপনজনের সাথে তুলনা করে বলেছেন, "তোমরা তোমাদের আপনজন ও আত্মীয়স্বজনদের সাথে যেমন ব্যবহার কর, তাদের সঙ্গে অনুরূপ ব্যবহার করবে"। একই কথা মহানবী (সা) আরেক হাদিসে উল্লেখ করেছেন এভাবে, 'তোমরা অধীনস্তদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবে এবং তাদেরকে কোন রকমের কষ্ট দেবে না। তোমরা কি জান না, তাদেরও তোমাদের মতো একটি হৃদয় আছে। ব্যথা দানে তারা দুঃখিত হয় এবং কষ্টবোধ করে। আরাম ও শান্তি প্রদান করলে সন্তুষ্ট হয়। তোমাদের কী হয়েছে যে, তোমরা তাদের প্রতি আন্তরিকতা প্রদর্শন কর না।' (সহিহ বুখারি)। হযরত সালাম ইবন (রা) হতে বর্ণিত, রাসুল (সা) বলেছেন, 'তারা (শ্রমিক বা অধিনস্থ বা ক্রীতদাস) হচ্ছে তোমাদের ভাই, সুতরাং তাদের সাথে সদয় ব্যবহার কর। তোমাদের একার পক্ষে যে কাজ করা অসম্ভব, তাতে তাদের সাহায্য গ্রহণ কর; আবার তাদের একার পক্ষে যে কাজ করা অসম্ভব, তাতে তোমরাও তাদেরকে সাহায্য কর।' (মুসনাদ আহমাদ : ১৯০) হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাসিসে রাসুল (সা) বলেন : কর্মচারীকে তাহার কর্মসম্পাদনের সাহায্য করবে। কেননা, আল্লাহর কর্মচারী ব্যর্থকাম হয় না। (আল-আদাবুল মুফরাদ: ১৯১) আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ (সা) কে আমার এ ঘরে বলতে শুনেছি, " হে আল্লাহ! যে আমার উম্মতের কোন কাজের কিছু দায়িত্ব নিয়ে তাদেরকে কষ্টে ফেলবে, তুমি তাকে কষ্টে ফেলো। আর যে আমার উম্মতের কোন কিছুর দায়িত্ব নিয়ে তাদের সাথে নম্রতা করবে, তুমি তার সাথে নম্রতা করো।" (সহিহ মুসলিম: ১৮২৮) হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদিসে রাসুল (সা) বলেছেন, মমলুককে (তথা দাস-দাসী কিংবা চাকর-চাকরানি) ঠিকমত খাদ্য ও পোশাক দিতে হবে। তার দ্বারা এমন কোন কাজ নেওয়া হবেনা, যা ক্ষমতাবহির্ভূত (অর্থ্যাৎ তার সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ সে করবে, সাধ্যাতীত কাজ দেওয়া বৈধ নহে)।

(মুয়াত্তা ইমাম মালিক (র) ২য় খণ্ড বদনজর অধ্যায়) মুয়াত্তা ইমাম মালিকে আরও উল্লেখ আছে, উমর ইবনে খাত্তাব (রা) প্রতি শনিবারে মদীনার পার্শ্ববর্তী গ্রাম সমূহে গমন করতেন। যদি কোন গোলামকে এমন কাজ করতে দেখতেন যা তার শক্তির বাহিরে হতো,

তবে তিনি তা কম করিয়ে দিতেন। (অর্থ্যাৎ কাজ কমিয়ে গোলামের বোঝা হালকা করে দিতেন)। অধীনস্ত শ্রমিক- কর্মচারীদের সাথে সদয় আচরণ করা ও তাদের থেকে বোঝা হালকা করা শুধু তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা নয়; বরং এটা একটি পুণ্য কাজও বটে। এ প্রসঙ্গে প্রিয় নবী (সা) বলেছেন: 'তোমরা তোমাদের অধীনস্ত কর্মচারীদের থেকে যতটা হালকা কাজ নেবে, তোমাদের আমলনামায় ততটা পুণ্য লিপিবদ্ধ করা হবে।' (শুয়াবুল ঈমান: ৮৩৪৩) হযরত নাফি ইবন আসিম (রা) বলেন,তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আমর (রা) কে বলতে শুনেছেন, যখন কোন ব্যক্তি তাহার স্বগৃহে তাহার মজুর বা কর্মচারীদের সাথে কাজ করে তখন সে হয় আল্লাহ তায়ালার একজন কর্মচারী। (আল- আদাবুল মুফরাদ: ৪৫০)

মালিক-শ্রমিকের সুসম্পর্ক স্থাপনের জন্য এবং সদাচরণের নিমিত্তে রাসুল (সা) আহারের সময় অধীনস্ত খাদেমকেও সঙ্গে নিয়ে বসার জন্য নির্দেশনা দিয়েছেন। হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাসিসে রাসুল (সা) বলেছেন, যখন তোমাদের মধ্যকার কারও খাদেম তার আহার্য নিয়া আসে,তখন তাকেও সাথে বসিয়ে নেওয়া উচিত। সে যদি তাতে সম্মত না হয়, তবে তাকে তা হতে কিছু দিয়ে দেওয়া উচিৎ।(আল–আদাবুল মুফরাদ: ২০০) অন্য হাসিসে এসেছে , 'তোমাদের কারোর খাদেম যখন তার জন্যে খাবার নিয়ে আসবে, তখন তাকে সঙ্গে বসিয়ে না খাওয়ালেও তাকে অবশ্যই এক মুঠি বা দুই মুঠি খাবার দেবে। কেননা সে-ই তার ব্যবস্থাপনায় দায়িত্বশীল। (সহিহ বুখারি: ৪১৮)। রাসুল (সা) আরও বলেছেন, 'তোমাদের খাদেম যদি তোমাদের খাদ্য প্রস্তুত করে এবং তা নিয়ে যদি তোমাদের কাছে আসে যা রান্না করার সময় আগুনের তাপ দেয় ও ধোঁয়া তাকে অনেক কষ্ট দিয়েছে তখন তাকে খাওয়াবে। খানাপিনা অল্প হলেও তার হাতেও এক মুঠো দুমুঠো তুলে দিবে। (সহিহ মুসলিম : ১৫৬৭) রাসুল (সা) মালিকদের নির্দেশ দিয়েছেন, তারা যেন কর্মচারী, শ্রমিক ও অধীনস্তদের সাথে সন্তান-সন্ততির ন্যায় আচরণ করে এবং তাদের ইজ্জত-সম্মানের কথা স্মরণ রাখে। হাসিসে এসেছে রাসুল (সা) বলেছেন, তোমরা তাদেরকে এমনভাবে স্নেহ করবে যেভাবে নিজের সন্তানদের করো এবং তাদেরকে সে খাবার দিবে যা তোমরা নিজেরা খাও। (ইবনে মাজাহ: ৩৬৯১)।

ইসলাম অধীনস্তদের প্রতি সহনশীল হতে শিক্ষা দেয় এবং অধীনস্ত শ্রমিক-কর্মচারীদের দোষক্রটি ক্ষমা করে দিতে উৎসাহিত করে। শ্রমিকের প্রতি মালিক যাতে সহনশীল থাকে এবং তার ভুলক্রটি ক্ষমার মতো মহৎ মনের অধিকারী হয়, সেই বিষয়টি নিশ্চিত করার তাগিদ দিয়ে রাসুল (সা) এক হাসিসে বলেছেন, 'মজুর চাকরদের অপরাধ অসংখ্যবার ক্ষমা করা মহত্ত্বের লক্ষণ। আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বলেছেন, এক ব্যক্তি নবী করীম (সা) এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ (সা) চাকর-বাকরের অপরাধ আমি কতবার ক্ষমা করব? রাসুল (সা) চুপ রইলেন। সে পুনরায় তাঁকে প্রশ্ন করলে এবারও তিনি চুপ রইলেন। সে পুনরায় তাঁকে প্রশ্ন করলে এবারও তিনি চুপ রইলেন। চতুর্থবার বলার পর বললেন, 'প্রত্যেক দিন সত্তরবার তাকে ক্ষমা করবে। (আবু দাউদ)। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব বিশ্বনবী হযরত মোহাম্মাদ (সা) অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে শ্রমিকের হাতে চুমু খেতেন। তিনি আনসারির হাতে চুমু খেয়ে বললেন, 'এই হাতে কখনো জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না'।(সহিহ মুসলিম : ১৫৬৭) এ প্রসঙ্গে রাসুল (সা) আরও বলেন, তোমরা মুমিনদেরকে পরস্পরের প্রতি অনুগ্রহ, মায়া-মহব্বত ও সৌহার্দ্য প্রদর্শন করার ক্ষেত্রে এক শরীরের ন্যায় দেখবে। তার কোন অংশে কষ্ট অনুভূত হলে পুরো শরীরে কষ্ট অনুভূত হয়। (সহিহ বুখারি)

রাসুল (সা) এর অনুকরণে তার সাহাবায়ে কেরামও তাদের অধীনস্তদের সঙ্গে উত্তম ব্যবহারের অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। একদা হযরত ওমর (রা) আপস চুক্তি সম্পাদনের জন্য যখন বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে রওনা হলেন তখন তিনি এবং তার ভৃত্য পালাক্রমে উটের ওপর সওয়ার হয়ে মদিনা থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত দীর্ঘপথ অতিক্রম করেছিলেন। এমনকি বায়তুল মুকাদ্দাসে পৌঁছার পর সেখানকার লোকেরা বুঝতে পারেনি এ দুয়ের মধ্যে কে আমীরুল মুমিনীন!। কবির ভাষায়- "ভৃত্য চড়িল উটের পৃষ্ঠে উমর ধরিল রশি/ মানুষে স্বর্গে তুলিয়া ধরিয়া ধুলায় নামিল শশী"- (কাজী নজরুল ইসলাম) ।

আজকের সমাজে ক্রীতদাস প্রথা নেই সত্য তবে অধীনস্তদের প্রতি জুলুম-অত্যাচার অহরহ চালু আছে। ইসলামে সকল দায়িত্বশীল ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তার প্রতি নির্দেশ রয়েছে যেন প্রত্যেকেই নিজ নিজ অধীনস্তদের সাথে সদ্ব্যবহার করে এবং তাদের ওপর কোনো প্রকার জুলুম-অত্যাচার না করে।' পৃথিবীতে যত আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা সুন্দর কথা দিয়েই হয়েছে। অসুন্দর কথা ও খারাপ ভাষা প্রয়োগ করে কোন আদর্শ পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ভাল কথা দিয়ে সহজেই মানুষের মন জয় করা যায়। একটি সুন্দর কথা ভালো গাছের মতো, মাটিতে যার শিকড় বদ্ধমূল, আকাশে যার শাখা বিস্তৃত, যে গাছ অফুরন্ত ফল দান করে।

বর্তমানে লক্ষ্য করা যায়, অনেক অফিস-আদালতে কর্তাব্যক্তিরা ছোটখাট কোন কারণে অধীনস্তদের হুমকি-ধমকি দিয়ে দমিয়ে রাখতে পছন্দ করে। ফলে অধীনস্তদের মনে সবসময় একটি অজানা ভীতি তাড়া করে ফিরে। কোন দোষ নেই, অপরাধ নেই তথাপিও অধীনস্তরা তাদের বড় সাহেবের ভয়ে সর্বদা তটস্থ হয়ে থাকে। এতে কর্তাব্যক্তির ভুলের সংশোধন হওয়ার সুযোগ থাকে না। তাই প্রতিষ্ঠানও তার কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছতে সক্ষম হয় না। অথচ প্রতিষ্ঠান প্রধান যদি তার অধঃস্তনের সাথে উত্তম ব্যবহার করতেন তাহলে অধীনস্তরা প্রাণ খুলে আল্লাহর কাছে তাঁর জন্য দো'আ করত। সবাই মিলেমিশে প্রতিষ্ঠানের উন্নতির জন্য কাজ করতে পারত। প্রতিষ্ঠান তার কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছতে সক্ষম হতো। রাফি ইবনু মাকীস (রা) সূত্রে বর্ণিত, তিনি হুদায়বিয়ার সন্ধিতে রাসুল (সা) এর সঙ্গে অংশগ্রহণকারীদের অন্যতম ছিলেন। রাসুল (সা) বলেছেন : (দাস-দাসী বা চাকর–চাকরানীর সাথে) উত্তম ব্যবহার প্রাচুর্য বয়ে আসে এবং মন্দ আচরণ দুভার্গ্য টেনে আনে। (আহমদ)

আমরা যারা ইনসাফ ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা কায়েমের আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছি আমাদেরকে সর্বপ্রথম রাসুলুল্লাহ (সা) এর সুন্নাহকে অনুসরণে এগিয়ে আসতে হবে। ইনসাফের বাস্তব নমুনা আমাদের অধীনস্ত শ্রমিক কিংবা আমাদের প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিকের নিকট উপস্থাপন করতে হবে। আসুন আমরা অধীনস্তদের সাথে আচরণে রাসুল (সা) দেখানো সুন্নাহকে অনুসরণ করার চেষ্টা করি। রাসুল (সা) এর এ সুন্নাহকে সমাজ জীবনে প্রস্ফুটিত করে তুলি। নিজেদের আচার–আচরণে দাম্ভিকতা ও অহংবোধ পরিহার করে বিনয়ী হওয়ার চেষ্টা করি। আল্লাহর বান্দাদের সঠিক মর্যাদা প্রদানের পদক্ষেপ গ্রহণ করি। সমাজ ও রাষ্ট্রে ইনসাফকে প্রতিষ্ঠার জন্য ভূমিকা পালন করি। আমাদের আচরণে কাউকে কষ্ট না দেই। সকলের সাথে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করি। মহান রাব্বুল আলামিন আমাদের তৌফিক দান করুন।

লেখক: সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

মহানবী (সা) এর শ্রম প্রশাসন

ড. মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম

রাষ্ট্রচিন্তা ও প্রশাসনিক উন্নয়নের ইতিহাসে মহানবী (সা) প্রতিষ্ঠিত মদিনার ইসলামী রাষ্ট্র এক অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে। মদিনায় প্রতিষ্ঠিত এই রাষ্ট্রটি ছিল মানবজাতির ইতিহাসের সর্বোত্তম জনকল্যাণ মূলক, ন্যায় বিচার, উন্নয়ন, সুশাসনে উদ্ভাসিত শ্রমবান্ধব গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। ইসলামী আদর্শের পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন, ইসলামের সর্বাত্মক বিজয় প্রতিষ্ঠা এবং ইসলামের মাধ্যমে শ্রমজীবী মেহনতি মানুষসহ সকল মানুষের সার্বিক কল্যাণ সাধনই ছিল মহানবী (সা) প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের একমাত্র লক্ষ্য। মদীনা ইসলামী রাষ্ট্রের প্রশাসন ছিল স্বতন্ত্র ও সুসংগত এক সিস্টেম। রহমাতুল্লিল আলামিন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) শুধুমাত্র একজন নবীই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একাধারে একজন শ্রেষ্ঠ সমাজ সংস্কারক, মানুষের মুক্তিদূত, বার্তাবাহক, নেতা, পথপ্রদর্শক, বরকতের অবারিত দ্বার, সতর্ককারী, সুসংবাদদাতা ও মহান রাষ্ট্র প্রধান। তিনি ছিলেন ধর্ম ও রাষ্ট্র উভয় সংস্থার পরিচালক।

(ড. মফিজুল্লাহ কবীর, মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ.৮৭)। তাঁর জীবন সাধনার একটি অনন্য গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হল মদীনায় ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা। রাসুলুল্লাহ(সা) এর নিজের সমস্ত কার্যক্রম মানুষের কল্যাণে নিবেদিত ছিল। এতে ধর্ম, বর্ণ, ধনী, গরিব, মালিক-শ্রমিক ও অঞ্চলের পার্থক্য পরিলক্ষিত হতো না। শ্রমজীবী মানুষসহ সকলের জন্য সার্বজনীন কল্যাণ পরবর্তীকালে ইসলামী রাষ্ট্রের লক্ষ্য হিসেবে অনুসৃত হয়। আধুনিক কল্যাণ রাষ্ট্র ধারণার অনেক আগে মহানবী (সা) এর এই জনকল্যাণের ধারণা রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে অনেক অগ্রগামী ধারণা ছিল। গোত্র কলহে লিপ্ত যাযাবর ও মরুবাসী আরবদেরকে অসামান্য রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, সাংগঠনিক ক্ষমতা ও একনিষ্ঠতার মাধ্যমে একই সূত্রে গ্রথিত করে সপ্তম শতাব্দীর শুরুতে তিনি গোড়াপত্তন করেন একটি উম্মাহ ভিত্তিক রাষ্ট্রের।

এর মাধ্যমে মানব সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আল্লাহর প্রভুত্ব ও মানবিক সাম্য। শিরকের সকল চিহ্ন মূলোৎপাঠিত হয়েছিল সমাজের অঙ্গন হতে। অবসান হয়েছিল মানুষের উপর মানুষের কৃত্রিম প্রভুত্বের। মানুষ স্বাদ পেয়েছিল মুক্তি ও স্বাধীনতার, ফিরে পেয়েছিল মানুষ হিসেবে বিকশিত হবার সকল প্রকারের মৌলিক অধিকার, প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আইন ও ন্যায়ের শাসন, সুশাসন। শাসক পরিণত হয়েছিল জনগনের সেবক। মানুষের নিরাপত্তা ও জরুরীয়াত মৌলিক প্রয়োজন পূরণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল রাষ্ট্র। সমাজে শ্রমজীবী ও নারীরা প্রথমবারের মত পেয়েছিল মর্যাদার আসন। রচিত হয়েছিল ক্রীতদাস ও দাসীদেরও মুক্তির সোপান। সমাজ থেকে আর রিবা বা সুদ উচ্ছেদ হয়ে তদস্থলে প্রবর্তিত হয়েছিল জনকল্যাণমুখী যাকাত ব্যবস্থা। ধনী ও দরিদ্রের বিশাল বৈষম্য হয়েছিল সংকুচিত। মদীনা রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান হয়েছিলেন মহানবী (সা) স্বয়ং। মহান আল্লাহর অহির মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনার প্রয়োজনীয় বিধি বিধান অবতীর্ণ করতে থাকেন। আর মহানবী (সা) তাঁর সাথিদের সাথে শূরা বা পরামর্শ ও সহযোগিতার মাধ্যমে সেই সব বিধি-বিধান কার্যকর করতে থাকেন। অল্প সময়ের মধ্যেই গড়ে উঠেছিল একটি সুন্দর প্রশাসনিক ব্যবস্থা। কুরআনের আদেশ-নিষেধ ইসলামী রাষ্ট্র ও প্রশাসনের জন্য বাধ্যতামূলক অনুস্বরণীয় ছিল। কুরআনে কোনো মীমাংসা পাওয়া না গেলে মহানবী (সা) বিজ্ঞ ও পরহেজগার সাহাবিদের পরামর্শ নিয়ে রাষ্ট্রের সকল কাজ সম্পাদন করতেন। একে বলা হয় মজলিসে শূরা। ঐতিহাসিকদের মতে, মহানবী (সা) প্রতিষ্ঠিত মদীনার রাষ্ট্রটি ছিল মানব ইতিহাসের প্রথম সাংবিধানিক রাষ্ট্র এবং সর্বোত্তম জনকল্যাণকামী রাষ্ট্র। রাসুল মুহাম্মদ (সা) এর জীবদ্দশাতেই এই রাষ্ট্রের বিস্তৃতি ঘটেছিল মদীনা ছাড়িয়ে আরব উপদ্বীপের প্রায় ১৯ লক্ষ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে।

মহানবীর শ্রম প্রশাসনের বৈশিষ্ট্য

১। মহানবী (সা) মদীনা রাষ্ট্রে এমন একটি শ্রম প্রশাসন কায়েম করতে সক্ষম হয়েছিলেন যা ছিল কুরআনের শিক্ষার আলোকে উদ্ভাসিত। এ প্রশাসনের ভিত্তি ছিল তাওহীদ ও রবুবিয়াত, খিলাফত ও রিসালাত এবং আখিরাত ও জবাবদিহিতার তীব্র অনুভূতি। আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করার অনুভূতিই মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রের সকল নাগরিককে যাবতীয় অন্যায়, জুলুম, বৈষম্য, শ্রম শোষণ তথা আল্লাহর আবাধ্যতা থেকে বিরত রেখেছিল এবং আল্লাহর বিধানের অনুগত বানিয়ে দিয়েছিল।

২। তাওহীদ, রিসালাত, খিলাফত ও আখিরাতের ভিত্তির উপর মদীনা রাষ্ট্রের যে শ্রম প্রশাসন সংগঠিত হয়েছিল তার লক্ষ্য ছিল:

- শ্রমজীবী মেহনতি মানুষসহ সকল নাগরিকের ইহকালীন কল্যাণ নিশ্চিত করা;
- সুবিচার ইনসাফ প্রতিষ্ঠা;
- ক্ষতি, বিপর্যয় ও জুলুমের সকল পথ বন্ধ করা;

■ রাষ্ট্রে বসবাসকারী মেহনতি মানুষসহ সর্বস্তরের জনগণের মৌলিক প্রয়োজন যথাযথভাবে পূরণের ব্যবস্থা করা;

■ আয় ও সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করা;

■ ভারসাম্যমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে সামাজিক স্থায়িত্ব বজায় রাখার ব্যবস্থা করা;

■ আল্লাহর সৃষ্টিকূলের প্রতি অনুকম্পা এবং সকল সৃষ্টি ও মানুষের জন্য নির্মল ও সুস্থ পরিবেশ গড়ে তোলা।

৩। মদীনা রাষ্ট্রের শ্রম প্রশাসনের ভিত্তি ছিল অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচার আদল ও ইহসান। তা ছিল জাহিলিয়্যাতের যুগের সব অন্যায়, অত্যাচার, শোষণ ও বেইনসাফী হতে মুক্ত। আদল মানে সুবিচার, ন্যায়বিচার, ইনসাফ, ন্যায্য ও সুষম নীতি। দুটি স্বতন্ত্র সত্যের সমন্বয়ে আদল গঠিত। (১) মানুষের অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে ভারসাম্য ও সাদৃশ্য প্রতিষ্ঠা করা। (২) প্রত্যেককে যথাযথভাবে তার অধিকার প্রদান করা। কোনো পক্ষপাতিত্ব না করে যার যা প্রাপ্য তাকে তা দেওয়ার নাম আদল। প্রকৃতপক্ষে আদলের দাবি হচ্ছে ভারসাম্য ও সামঞ্জস্য। শ্রমজীবী মানুষসহ প্রত্যেক নাগরিককে তার নৈতিক, সম্পর্কগত, অর্থনৈতিক, আইনগত, রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকার পূর্ণ ঈমানদারির সাথে যথাযথভাবে প্রদান করা। ন্যায়বিচারের অন্য অর্থ সমাজ হতে অন্যায় ও জুলুমের উচ্ছেদ এবং সবল প্রতিরোধ। ইসলামী শরীয়াহর ব্যত্যয় জুলুমকেই ডেকে আনে। জুলুমের সময়োচিত প্রতিরোধ ও উচ্ছেদ না হলে দুর্বল ও দরিদ্র জনগোষ্ঠী, শ্রমজীবী মেহনতি মানুষ প্রতারিত, নিগৃহীত, বঞ্চিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ জন্যই মহানবী (সা) এর শ্রম প্রশাসনে এর প্রতিবিধানের উদ্দেশ্যে আদল ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠাকে অন্যতম মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছিল। আদল বা সুবিচারের স্বার্থে আইনের তাৎক্ষণিক ও যথাযথ প্রয়োগ মদিনা রাষ্ট্রে সুনিশ্চিত করা হয়েছিল।

একই সাথে ইহসান বা কল্যাণ পরায়ণতা, পরোপকার, দায়িত্বের চাইতেও অধিক কর্তব্যবোধ এর প্রসঙ্গটি মদীনা রাষ্ট্রের শ্রম প্রশাসনে গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হয়েছিল। ইহসান মানে সুন্দর ব্যবহার, হৃদ্যতাপূর্ণ আচরণ, অপরকে তার অধিকারের চেয়ে বেশি দেওয়া, অতিরিক্ত কাজের জন্য অতিরিক্ত মজুরি প্রদান, শ্রমজীবীকে ব্যবসার লভ্যাংশ প্রদান, সহানুভূতিপূর্ণ আচরণ, ক্ষমা ও অনুগ্রহ প্রদর্শন, নিজের অধিকারের চেয়ে কম পেয়েও সন্তুষ্ট থাকা। ইহসান আদলের চেয়ে বেশি কিছু। কোন সমাজ কেবল আদলের নীতির ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না যেখানে সমাজের সকল সদস্য হরহামেশা মেপেমেপে নিজের অধিকার নির্ণয় ও আদায় করে, আর অপরের অধিকার কতটা রয়েছে তা খতিয়ে নির্ধারণ করে এবং কেবল ততটুকুই দিয়ে এ ধরনের একটি সমাজে দ্বন্দ্ব-সংঘাত ঘটবে না বটে কিন্তু সামগ্রিকভাবে সে সমাজে প্রেম ভালবাসা, কৃতজ্ঞতা, মহাত্ম, উদারতা, ত্যাগ ও কুরবানি, নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতা এবং অপরের কল্যাণ কামনার মত মহাউত্তম বৈশিষ্ট্যসমূহ হতে বঞ্চিত থেকে যায়। অথচ এ গুণগুলো তথা ইহসান হচ্ছে মালিক-শ্রমিক নির্বিশেষে ব্যক্তিজীবনে সজীবতা ও মাধুর্য সৃষ্টির এবং সমাজ জীবনে সৌন্দর্য ও সুষমা বিকাশের উপাদান। ইহসানের সাথে মেহনতি মানুষের জন্য আর্থ সামাজিক সুবিচার এবং কার্যক্রমের যে আদেশ আল্লাহ দিয়েছেন এ জন্যই তা বাস্তবায়নকে মদিনা রাষ্ট্র

মদীনা রাষ্ট্রে ব্যক্তির সম্পদে রাষ্ট্রের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বৈধ পন্থায় উপার্জিত ধন-সম্পদে অন্যদেরও অধিকার রয়েছে। বিশেষতঃ আত্মীয়স্বজন, খেটে খাওয়া শ্রমজীবী এবং সমাজে যারা মন্দভাগ্য তাদের প্রতি সহযোগিতা ও সহমর্মিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া প্রতিটি বিত্তবান নাগরিকের ঈমানী দায়িত্ব। কুরআনের শিক্ষা অনুসারে নাগরিকগণ নিজেদের প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের পর যাদের হাতে উদ্বৃত্ত অর্থ থাকত তারা দরিদ্র শ্রমজীবী, আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশী ও সমাজের অসহায়, বঞ্চিত ভাগ্যাহত নাগরিকদের ন্যূনতম প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্য তা বাধ্যতামূলক ভাবে ব্যয় করত।

ফরজ হিসেবে গ্রহণ করেছিল। মদীনা রাষ্ট্রের শ্রম প্রশাসনে কড়া নজর রাখা হত যাতে আদল ও ইনসাফ কায়েম থাকে এবং কোন জুলুম হতে না পারে।

৪। মদীনা রাষ্ট্রের শ্রম প্রশাসনের লক্ষ্য ছিল সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার। যাবতীয় বস্তুগত ও মানবীয় সম্পদের পূর্ণাঙ্গ ও দক্ষতাপূর্ণ ব্যবহার মদীনা রাষ্ট্রে নিশ্চিত করা হয়েছিল। এ রাষ্ট্রে সবাই ছিলেন শ্রমজীবী। মানবকল্যানের লক্ষ্য হাসিলের জন্যই মহানবী (সা) অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সকল জনশক্তিকে ব্যবহার করে সসীম সম্পদের দক্ষতাপূর্ণ বরাদ্দ ও ব্যবহার করেছিলেন। মদীনা রাষ্ট্রের শ্রমনীতিতে সম্পদ ও সেবা প্রাপ্তি এবং ত্যাগ উভয়ের মধ্যেই কল্যাণ নিহিত আছে বলেই মনে করা হত। সম্পদের ব্যবহার ও ভোগ শুধুমাত্র ইহজাগতিক সুখের জন্য নয়। এর যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে পরকালীন কল্যাণও নিশ্চিত করতে হবে। সম্পদের যথার্থ ব্যবহারের মাধ্যমে আখেরাতে শান্তির আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে, আল্লাহ তোমাকে যে ধন-সম্পদ দিয়েছেন তা দ্বারা আখেরাতের ঘর বানানোর চিন্তা কর, অবশ্য দুনিয়া হতেও তোমার অংশ নিতে ভুলে যেয়ো না। (সুরা ২৮ আল কাসাস: ৭৭)।

৫। মদীনা রাষ্ট্রের শ্রম প্রশাসনের অন্যতম লক্ষ্য ছিল শ্রমজীবী মেহনতি বঞ্চিতদের অর্থনৈতিক প্রয়োজন মিটানো এবং তাদের মানবিক মর্যাদার যথাযথ প্রতিষ্ঠা। মদীনা রাষ্ট্রে ব্যক্তির সম্পদে রাষ্ট্রের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বৈধ পন্থায় উপার্জিত ধন-সম্পদে অন্যদেরও অধিকার রয়েছে। বিশেষতঃ আত্মীয়স্বজন, খেটে খাওয়া শ্রমজীবী এবং সমাজে যারা মন্দভাগ্য তাদের প্রতি সহযোগিতা ও সহমর্মিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া প্রতিটি বিত্তবান নাগরিকের ঈমানী দায়িত্ব। কুরআনের

শিক্ষা অনুসারে নাগরিকগণ নিজেদের প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের পর যাদের হাতে উদ্বৃত্ত অর্থ থাকত তারা দরিদ্র শ্রমজীবী, আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশী ও সমাজের অসহায়, বঞ্চিত ভাগ্যাহত নাগরিকদের ন্যূনতম প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্য তা বাধ্যতামূলক ভাবে ব্যয় করত। সমাজের বিত্তহীন ও অভাবগ্রস্ত শ্রমজীবী মানুষের প্রয়োজন পূরণ ও কল্যাণ সাধনের জন্য দেওয়া কুরআনিক নির্দেশনা মদীনা রাষ্ট্রের শ্রম প্রশাসনে বাস্তবায়িত হয়েছিল।

৬। মদীনা রাষ্ট্রের শ্রম প্রশাসন যে শ্রমনীতি কায়েম করেছিল তাতে প্রত্যেকের স্বাধীনভাবে পেশা নির্বাচন করে জীবিকা অর্জন করার অধিকার ছিল। অন্য কথায় জীবিকা অর্জনের পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল। এ পৃথিবীতে আল্লাহর যে নিয়ামতসমূহ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে, যে অফুরন্ত সম্পদ ভান্ডার রয়েছে তা খুঁজে বের করে যথার্থ ব্যবহারের মাধ্যমেই আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিল করা যায়। মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে মদীনা রাষ্ট্রের সকল নাগরিক ও শ্রমজীবীরা স্বাধীনভাবে ব্যবসায়, চাষাবাদ, হস্তশিল্প, পশুপালন এবং অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ও পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। উৎপাদন কার্য চলত স্বাধীনভাবে। উৎপাদন কর্মকাণ্ডে সাহাবিরা নিজেরাও অংশগ্রহণ করতেন এবং প্রয়োজনবোধে মজুরও নিয়োগ করতেন। ইতিহাসে অনেক সাহাবির মজুরির বিনিময়ে কাজ করার ও শ্রমদানের উদাহরণ রয়েছে। শ্রমিকের ন্যায্য মজুরি নির্ধারণ ও যথাসময়ে পরিশোধের ব্যাপারে মহানবী (সা) সতর্ক ও সাবধান থাকার জন্য কঠোর নির্দেশনা দিয়েছেন, যাতে এ নিয়ে কোন মনোমালিন্য বা অসন্তোষ তৈরী না হয়। এক্ষেত্রে তিনি ইনসাফপূর্ণ নীতি অনুসরণ করতে বলেছেন। একজন শ্রমিক যাতে যথাসময়ে ন্যায্য মজুরি অনায়াসে পেতে পারেন সেদিকে খেয়াল রাখা প্রত্যেক নিয়োগকারীর প্রধান কর্তব্য। কেননা, শ্রমিক তার কাজ শেষে সঠিক সময়ে সঠিক মজুরি না পেলে তার ভেতরে কষ্ট, হাহাকার ও হতাশা জন্ম নেয়। শ্রমিক তখন মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়েন। তার কর্মস্পৃহা হ্রাস পায়। পরিবার পরিজনের ভরণপোষণের খরচ যোগাতে গিয়ে তিনি তখন দিশেহারা হয়ে পড়েন। মহানবী (সা) বলেছেন, কর্মে নিয়োগ কালীনই মজুরির পরিমাণ সম্পর্কে শ্রমিককে জানিয়ে দাও। (কানজুল উম্মাল, হা-৯১২৬)। মজুরি নির্ধারণ ব্যতীত কোন শ্রমিককে কাজে নিয়োগ করা অনুচিত। (সহীহ আল বুখারী)। শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকাবার পূর্বেই তার মজুরি পরিশোধ করে দাও। (ইবনে মাজাহ) যে ব্যক্তি শ্রমিককে মজুরি প্রদানে জুলুম করে আল্লাহ তার ইবাদত কবুল করবেন না। (আমালি আস সাদুব, হা-৭০৭)।

শ্রমিকের অতিরিক্ত কাজ এর জন্য অতিরিক্ত মজুরি প্রদান করতে হবে। মহানবী (সা) বলেন, তোমরা যদি তাদের উপর অধিক কাজের দায়িত্ব চাপাও, তবে সে হিসেবে বাড়তি মজুরি দিয়ে তাদের সাহায্য কর।

শ্রমিককে ব্যবসার, শিল্পোৎপাদনের লভ্যাংশ প্রদান করতে হবে। মালিকের লভ্যাংশে শ্রমিকেরও হিস্যা থাকা প্রয়োজন। এটিই ইনসাফের নীতি। মহানবী (সা) বলেন, মজুর ও শ্রমিককে তার শ্রমোৎপাদিত দ্রব্য থেকেও অংশ প্রদান কর। কারণ, আল্লাহর মজুরকে কিছুতেই বঞ্চিত করা যায় না। (মুসনাদে আহমদ)

শ্রমিককে ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে। কাজ কারার সময় শ্রমজীবীকে যথেষ্ট ঝুঁকি নিতে হয়। তিনি শ্রম, ঘাম দেন। তার পুরো দেহ, মন ও মনন নির্দিষ্টভাবে মালিকের কাজে নিবেদিত হয়। মাথার বুদ্ধি, কানের শ্রবনশক্তি, চোখের দৃষ্টি, বাহুর বল, পায়ের পদচারণা ইত্যাদি যুগপৎভাবে কাজ করে চলে। ফলে কর্মরত অবস্থায় দেহের যে কোন অংশ যে কোন সময় যখম হওয়ার ঝুঁকি থাকে। সুতরাং যদি শারীরিক কোন জখম হয় সেক্ষেত্রে শ্রমিকের অধিকার থাকে মালিকের পক্ষ থেকে চিকিৎসা সুবিধা লাভের। মহানবী (সা) বলেছেন, ক্ষতি যথাসাধ্য প্রতিরোধ ও পূরণ করতে হবে। (আহকামুল আমল ওয়াহকুকুল আম্মাল, পৃ.২৬)

শ্রমজীবীদের প্রতি মালিকের সার্বিক আচরণ হবে সহানুভূতিসুলভ ও হৃদ্যতাপূর্ণ। মালিক হবেন সত্যিকার অর্থেই শ্রমবান্ধব। কাজ করতে গিয়ে শ্রমজীবীরা ভুল করতে পারেন। ভুল ইচ্ছেকৃত আবার অনিচ্ছাকৃত ভাবেও হতে পারে। প্রতিটি অনিচ্ছাকৃত ভুল মার্জনা করা যেতে পারে। মহানবী (সা) বলেছেন, মজুরের অপরাধ অসংখ্যবার ক্ষমা করা মহত্ত্বের লক্ষণ। মালিকের পাশাপাশি শ্রমজীবীরও বিস্তর দায়িত্ব রয়েছে। শ্রমিক মালিকের প্রতি বিবেকের দাবি অনুযায়ী দায়বদ্ধ ও বিশ্বস্ত থ াকবেন। তার উপর অর্পিত দায়িত্বকে তিনি হালাল রুজী আহরণকল্পে ইবাদততুল্য জ্ঞান করবেন। শ্রমিক নির্ধারিত সময়ে কর্মস্থলে হাজির হবেন। নিষ্ঠার সাথে নিরলসভাবে মন দিয়ে কাজ করবেন। কাজের যাতে ক্ষতি না হয় অথবা মালিকের সম্পদেও যাতে কোনরূপ ক্ষতি না ঘটে সেদিকে শ্রমজীবী তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবেন। এ ব্যাপারে মহানবী (সা) বলেছেন, তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই স্ব-স্ব দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। (সহীহ আল বুখারী, মুসলিম)

শিল্প-কারখানা, ব্যবসায়-বাণিজ্য, দফতর-প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির উন্নতি সমৃদ্ধি নিহিত রয়েছে মালিক-শ্রমজীবী, কর্মকর্তা-কর্মচারী প্রমুখের মধ্যকার সুসম্পর্কের মাঝে। মালিক হবেন মানবিক। ক্রোধ ও সন্তুষ্টি সর্বাবস্থায় তিনি ইনসাফের উপর অটল থাকবেন। তার কথাবার্তা আল্লাহর স্মরণমূলক হবে। অত্যাচারীর হাত আল্লাহ তা'য়ালা অপছন্দ করেন। বৈষম্য, দ্বিমুখী নীতি ও কপটতা পরিহার করতে হবে। কর্মক্ষেত্রে শ্রমিক-কর্মচারীদের দৈহিক ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

শ্রমজীবীগণও মালিকের স্বার্থের দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখবেন। অনুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকবেন না। শ্রমিকগণ কাজ করবেন নিষ্ঠার সাথে, একাগ্রচিত্তে, নির্ভুলভাবে। মহানবী (সা) বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন কোন শ্রমের কাজ করবে তখন তা নিখুঁত ও নির্ভুলভাবে সম্পন্ন করবে, এটিই আল্লাহ তাআলা ভালবাসেন। (বায়হাকী)

শ্রমিক মালিক সম্পর্ক ও মনোভঙ্গী অনুপম, উদার, স্বচ্ছ, মানবিক, ন্যায়ানুগ ও আল্লাহভীরু হওয়ার ফলশ্রুতিতেই একটি প্রকৃত, মহিমাময় ও মুখরিত কর্ম পরিবেশ তৈরী হতে পারে আর এটিই মহানবী (সা) এর শ্বাশ্বত শিক্ষা।

মহানবী (সা) প্রবর্তিত মদীনা রাষ্ট্রের শ্রম প্রশাসনের প্রতি লক্ষ করলে এর স্থিতিস্থাপকতা ও গতিশীলতা দেখলে মুগ্ধ হতে হয়। বস্তুত ইসলামী শ্রমনীতি ও শ্রম প্রশাসন আধুনিক যুগে কার্যকরী করার জন্য সম্পূর্ণ উপযোগী।

লেখক: অর্থনৈতিক বিশ্লেষক ও ব্যাংকার

চা বাগানে এখনো সূর্য ওঠেনি

আশীষ মাহমুদ

চোখ বন্ধ করে মাত্র এক মিনিট একটু ভাবুন। দ্রব্যমূল্যের এই বাজারে আপনার বেতন দৈনিক ১২০ টাকা। মাস শেষে গিয়ে দাঁড়ায় যা তিন হাজার ছয়শত টাকায়। ধরে নেন সংসারে আপনি ছাড়া আর কেউ নেই! তবুও কি এই বেতনে আপনার সংসার চলবে? আশাকরি ভয় ও দুশ্চিন্তায় শরীর আঁতকে উঠবে।

এইবার চোখ খুলুন! আপনি যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন তার চারপাশে তাকিয়ে দেখুন তো কত শত অজস্র লোক চা পান করছে আর কতশত মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে যাচ্ছে। সব ছাড়ুন। এইবার আপনি বলুন তো সর্বশেষ কবে চা পান করেননি? আপনি যদি একান্তই নীরস প্রকৃতির না হয়ে থাকেন, তাহলে বলবেন ধুর মিয়া! চা ছাড়া কি এক মুহূর্ত চলা যায়? চা ছাড়া আমরা চলতে পারি কিনা এই বিতর্ক আগামী দিনের জন্য রেখে দিলাম। যে চায়ের চুমুকেই আমাদের জীবনে প্রাণবন্ত ভাব চলে আসে। সে চায়ের কারিগরদের জীবনে গত দুইশ বছর ধরে চলছে অব্যাহত শোষণ-নিপীড়ন।

১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশীর আম্রকাননে উপমহাদেশের স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়েছিল। তার পর পেরিয়ে গেছে কত শত বছর। এই সময়ে কত নদ-নদী শুকিয়ে খাল হয়ে গেছে। বদলে গেছে পরিবেশ-প্রকৃতি। একদেশ হয়েছে তিন ভাগে বিভক্ত। দেশের নামের সাথে যুক্ত হয়েছে কাগজে-কলমে স্বাধীন-সার্বভৌম। কিন্তু মানুষের জীবনে প্রকৃত স্বাধীনতা এসেছে কিনা, তা প্রতিবছর স্বাধীনতা দিবসের অন্যতম আলোচ্য বিষয়। আজকের বাংলাদেশ দুই দফায় স্বাধীন হয়েছে। একবার ব্রিটিশদের থেকে ভাগ হয়ে পাকিস্তান হয়েছে। আরেকবার পাকিস্তান থেকে ভাগ হয়ে বাংলাদেশ। প্রতিবারই স্বাধীনতার পেছনে যে কয়টা শব্দ বিশেষভাবে কাজ করেছে, তার মধ্যে অন্যতম হলো, শোষণ-নিপীড়ন। এই ভূখণ্ডের অধিকাংশ মানুষ শ্রমজীবী। প্রতিদিন মাথার ঘাম পায়ে ফেলে গায়ে-গতরে খেটে দুবেলা দুমুঠো ভাত খেতে পারলে তারা খুশি থাকে। কিন্তু এই স্বল্প চাহিদার মানুষদের সামান্য চাওয়া পাওয়াকে কোনদিন মেনে নিতে পারেনি একশ্রেণির রাজাধিরাজ মালিকরা। তারা এসব শ্রমিকদের শোষণ-নিপীড়ন করে যন্ত্রের মতো ব্যবহার করেছে এবং এখনো করছে। এসকল মালিকদের একটাই চাওয়া। তারা শ্রমিকের শ্রমে উৎপন্ন পণ্য উচ্চমূল্যে বিক্রি করে আয়েশী জীবন-যাপন করতে চায়। এটি করতে গিয়ে শ্রমিক মরল না বাঁচলো তাতে তাদের কিছু আসে যায় না।

শ্রমিকরা পেটের দায়ে সকল জুলুম নিপীড়ন ও শোষণকে মেনে নিয়েছে। যখন একদমই আর সহ্য করা যায় না তখন তারা প্রতিবাদে ফুসলে ওঠে। নেমে আসে রাজপথে। দাবি-দাওয়া আদায়ে মালিকদের গুন্ডাপান্ডাদের হাতে নির্মম নির্যাতন হতে শুরু করে পুলিশের জলকামানের গরম পানিও সহ্য করে। এসময় জীবন দিতে হয়েছে কতশত শ্রমিককে তার কোন হিসেব কেউ রাখেনি। এখানেই শেষ নয় ন্যায্য দাবি আদায় করতে গিয়ে চাকরিচ্যুত হয়েছে লাখ লাখ শ্রমিক। মিথ্যা মামলায় গ্রেফতার হয়ে কারাগারে কেটেছে অসংখ্য শ্রমিকের দিন-রাত। এরপরও যখন শ্রমিকরা রুটি-রুজির সংগ্রাম চালিয়ে যায় তখন শুরু হয় নানামুখী ভয়-ভীতি ও হুমকি দেওয়া। এসব করে যখন ফল আসে না। তখন মালিকরা ইমোশনাল ব্লাকমেল করে শ্রমিক ও সরকারকে।

শ্রমিকদের ধর্মঘটের কারণে মালিকরা নয় দেশের ক্ষতি হচ্ছে। রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কমে যাবে। এসব ইনিয়ে-বিনিয়ে কথা বলে সরকারকে প্রভাবিত করে শ্রমিকদের ওপর চূড়ান্ত শোষণ-নিপীড়ন চালানো হয়। এইভাবে চলছে আমাদের দেশের শ্রম অঙ্গন। শ্রমিক অঙ্গনের প্রতিটি সেক্টরে কিছু দিন পরপর একই দৃশ্য ঘুরে ফিরে দেখা যায়। আজ যা আমরা দেখতে পাচ্ছি চা শ্রমিকদের আন্দোলনে।

৩০০ টাকা দৈনিক মজুরির দাবিতে দেশের ১৬৭টি চা বাগানে ধর্মঘট চলছে। এইবারের ধর্মঘট একটু ভিন্নমাত্রা পেয়েছে। গণমাধ্যমে ওঠে আসছে চা শ্রমিকদের প্রতি গত দুইশ বছর ধরে চলা শোষণ-নিপীড়নের নির্মম ইতিহাস। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কল্যাণে দেশের মানুষ হতবাক হয়ে যাচ্ছে। আর প্রশ্ন তুলে বলছে, এই দ্রব্যমূল্যের বাজারে ১২০ টাকায় সংসার চলে?

ছলচাতুরী ও শোষণ-নিপীড়নের নির্মম ইতিহাস

১৮৩০ সাল। ভারতবর্ষে চলছে ব্রিটিশদের দখলদারিত্ব। চা পাতার ওপর চীনের প্রতি নির্ভরতা কমাতে ব্রহ্মপুত্রের অববাহিকায় চা চাষের পরিকল্পনা করে ব্রিটিশরা। আসামে চায়ের একটি জাত আবিষ্কার করার পর তারা এই এলাকায় চা চাষে আরও আগ্রহী হয়ে ওঠে। চীনের অনুকরণে আসাম ও উত্তর-পূর্ববঙ্গে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি চা বাগান তৈরি করে। বিশেষ করে দার্জিলিং, আসাম ও সিলেটে তারা কয়েকটি চা বাগান প্রতিষ্ঠা করে।

প্রথমে চীন থেকে চা বীজ ও যন্ত্রপাতির পাশাপাশি চীনের একদল বিশেষজ্ঞ ও কর্মী নিয়ে আসে। ১৮৫৪ সালে সিলেটের মালনিছড়ায় প্রথম বাণিজ্যিক চা বাগান প্রতিষ্ঠা করা হয়। তিন বছর পর সেই বাগান থেকে প্রথম বাণিজ্যিকভাবে চায়ের উৎপাদন করা হয়। এরপর থেকে পাল্লা দিয়ে বাগানের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯১০ সালের মধ্যেই সিলেটে ১৫৪টি চা বাগান প্রতিষ্ঠা করে ইউরোপীয়রা। অন্যদিকে ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বরে চীনা শ্রমিকরা ব্যাপকভাবে মৃত্যু বরণ করে এবং বাকি শ্রমিকরা মজুরিতে অসন্তুষ্ট হয়ে বাগান ছেড়ে চলে যায়। ফলে সংকটে পড়ে যায় চা চাষ। সংকট মোকাবিলার জন্য দরকার পড়ে অসংখ্য শ্রমিকের। তখনই তারা ছলচাতুরী ও প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করে।

এ সময় তারা ভারতবর্ষের বিভিন্নস্থান থেকে ভালো চাকরির লোভ দেখিয়ে শ্রমিক সংগ্রহ শুরু করে। বিহার, ওড়িষা, চেন্নাই, নাগপুর, সাঁওতাল পরগনা, মধ্যপ্রদেশ ও উত্তরপ্রদেশ থেকে প্রচুর পরিমাণে শ্রমিক সংগ্রহ করা হয়। এরা ছিল অদক্ষ। দক্ষ শ্রমিক সংগ্রহ করতে ব্রিটিশরা নজর দেয় ঢাকা, ময়মনসিংহ, নোয়াখালী ও ত্রিপুরার দিকে। শ্রমিকদের জন্য বাসস্থান ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার অঙ্গীকার করা হয়।

এরপরের ইতিহাস আর সুখকর নয়। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ যেসব শ্রমিকরা এসেছিলেন তারা ছিলেন দুর্ভিক্ষ পীড়িত এলাকার অধিবাসী। তাদেরকে 'কুলি' নামে ডাকা হতো। চা বাগানের মালিক ও কর্মকর্তারা তাদের সাথে দাসের মতো আচরণ করা শুরু করে।

শ্রমিক সংগ্রহের প্রক্রিয়াটি ছিল দাস কেনাবেচার মতো। শুরুর সময় লোভনীয় প্রস্তাব দিয়ে শ্রমিক সংগ্রহ করলেও পরবর্তীতে তারা একদল দালালের মাধ্যমে শ্রমিক সংগ্রহ শুরু করে। দালালরা শ্রমিকদের বিভিন্ন জায়গা থেকে ভয়, অপহরণ, ভুল বুঝিয়ে, অনেক সময় সহিংসতার মাধ্যমে তুলে আনতেন। এরপর এদেরকে প্রথমে জড়ো করা হতো একটি কেন্দ্রে। তারপর সেখান থেকে শ্রমিকদের বাগান মালিকদের নিকট বিক্রি করা দেওয়া হতো এবং বাগানে পাঠিয়ে দেওয়া হতো। যারা এসব কাজ করতেন তাদের বলা হতো আরকাত্তি।

চা বাগানে কাজ করতে আসা শ্রমিকরা ভেবেছিল তাদের জীবনমান উন্নত হবে। কিন্তু পরক্ষণে তাদের ভাবনা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। বাগানের মালিকরা যেহেতু শ্রমিকদের কিনে নিয়েছেন তাই তারা তাদের সাথে দাসের মতো আচরণ শুরু করে। মালিকরা মনে করতো, শ্রমিকরা তাদের সম্পত্তি। তাদের স্বাধীনতা তারাই নির্ধারণ করবেন। শুরু হয় নির্মম নির্যাতনের নতুন যাত্রা।

শ্রমিকরা বাগানে বন্দি হয়ে পড়ে। এক বাগান থেকে অন্য বাগানে মালিকরা পাহারা দিয়ে নিয়ে যেতো। বাগানের বাহিরে শ্রমিকদের যেতে দেওয়া হতো না। অনেকটা কারাগারের মতো শ্রমিকদের জীবন কাটাতে হতো। যার কারণে বংশ পরম্পরায় শ্রমিকদের সন্তানদের চা বাগানে কাজ করতে হতো। যা গত দুই শতাব্দীতে আর পরিবর্তন হয়নি।

বাগানের বন-জঙ্গলে বসবাস করতে গিয়ে শ্রমিকরা এক প্রতিকূল পরিবেশের মুখে পড়ে। নতুন আবহাওয়ার সাথে যুক্ত হয় বিভিন্ন বন্যপ্রাণীর সাথে লড়াই। বন্যপ্রাণীর আক্রমণে মারা যায় বেশ কিছু শ্রমিক। জঙ্গলে বসবাসের কারণে নানা রোগ দেখা দেয় শ্রমিকদের মাঝে। মালিকরা এসব রোগ থেকে বাঁচার জন্য কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। এসব থেকে মুক্তি পেতে শ্রমিকরা ফিরে যেতে চায় নিজ জন্মভূমিতে। কিন্তু মালিকরা তাদের যেতে দেয় না। অন্যদিকে ব্রিটিশ সরকার ১৮৬৫ ও ১৮৮২ সালে আইন করে বাগান থেকে কোন শ্রমিক পালিয়ে গেলে মালিকরা তাদের বাগানে বন্দি করে রাখতে পারবে এবং তাদের ওপর মারধর করতে পারবে। এই আইনি বৈধতা মালিকদের নির্মম নির্যাতনের পথ উন্মুক্ত করে দেয়। শুরু হয় শ্রমিকদের ওপর সীমাহীন নির্যাতন-নিপীড়ন ও শোষণের অবাধ দ্বার।

ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে যখন সারা ভারতবর্ষে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয় তখন এই অমানবিক পরিবেশ থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে শ্রমিকরা। ১৯২১ সালের ২০ মে বারো হাজার শ্রমিক জন্মভূমিতে ফেরত যাওয়ার উদ্দেশ্যে সিলেট ও আসামের বিভিন্ন স্থান থেকে এসে চাঁদপুরে জড়ো হয়। চাঁদপুর থেকে স্টিমারে করে গোয়ালন্দ পৌঁছে রেলে করে জন্মভূমিতে ফিরে যেতে চেয়েছিলেন তারা। কিন্তু তাদের বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে তখনকার ইউরোপীয়ান টি এসোসিয়েশন ও স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেট। তাড়াহুড়া করে স্টিমারে উঠতে গিয়ে অনেকে পদদলিত হয়ে মারা যায়।

যারা স্টিমারে উঠতে পারেনি তারা আর বাগানে ফিরে না গিয়ে চাঁদপুরে থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস তাদের মধ্যে কলেরা রোগ ছড়িয়ে পড়ে। ব্রিটিশ সরকার কলেরা রোগ ঠেকানোর নাম করে বিদ্রোহ দমনের সুযোগ নেয়। রাতের বেলা গুর্খা সৈন্যরা তাদের ওপর হামলা করে এবং ব্যাপকভাবে গুলি চালায়। সেদিনই সরকারি হিসেবে ৩০০ জন শ্রমিক নিহত হয়।

এই ঘটনার পর চা শ্রমিকরা আর কখনো নিজেদের জন্মভূমিতে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করেনি। চা বাগানের মালিকরা অন্য বাগানের শ্রমিকদের এই বার্তা দেয়, মালিকরাই শ্রমিকদের শেষ কথা। তাদের অবাধ্য হওয়া যাবে না। যারা পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে তাদের পরিণতি এদের মতো হবে।

১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের পর সিলেট ও চট্টগ্রামের চা শ্রমিকরা পূর্ব পাকিস্তানে থেকে যায়। তাদের বংশধররা আজকের বাগানে পূর্বসুরিদের কাজ করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে চা শ্রমিকদের অবদান

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর প্রায় পঁচিশ বছরের পাকিস্তানীদের শোষণ ও নিপীড়নের জাল ছিন্ন করে বাংলাদেশ রচিত হয়। এই মহান মুক্তি সংগ্রামের অন্যতম লক্ষ ছিলো অর্থনৈতিক মুক্তি। এই সংগ্রামে চা শ্রমিকরা চা বাগানে মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় ও তাদের খাদ্য সহায়তা দিয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন। মহান স্বাধীনতার পর

অন্য সকল নাগরিকদের ন্যায় তারাও এই ভূখণ্ডের নাগরিক হিসেবে মর্যাদা লাভ করে। দেশে নিবন্ধিত চা বাগান আছে ১৬৭টি। একটি চা বাগান করতে ন্যূনতম ২৫ একর জায়গা প্রয়োজন। তাই যারা ২৫ একর জায়গায় বাগান করতে পারেন না তাদের বাগানকে ফাঁড়ি বলা হয়। এই রকম অনিবন্ধিত ফাঁড়ি আছে বাগানের দিগুণ। এসব বাগান ও ফাঁড়িতে মোট জনগোষ্ঠী ৫ লাখের বেশি। এর মধ্যে চা শ্রমিক আছে ১ লাখ ৪০ হাজার ১৬৪ জন। যার ৬৪ শতাংশ নারী।

চা উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বের নবম। প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানে চীন ও ভারত। পাটের পর চা বাংলাদেশে দ্বিতীয় অর্থকরী ফসল। ২০২১ সালে দেশে মোট চা উৎপন্ন হয়েছে ৯ কোটি ৬৫ লাখ কেজি। দেশের আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে চায়ের চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশের বাজারে চা পাতার চাহিদা প্রায় ১০ কোটি কেজি। আমাদের দেশে উৎপন্ন থেকে চাহিদা বেশি। ফলে আমাদেরকে আমদানি করে ঘাটতি পূরণ করতে হয়।

পাটের আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজার দুষ্টচক্র দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হলেও চায়ের ক্রমবর্ধমান চাহিদা বাংলাদেশের জন্য আশার আলো। আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের চায়ের যথেষ্ট কদর রয়েছে। সীমিত সম্পদের এই দেশের অর্থনীতি মজবুত করার জন্য চা ও চা শ্রমিকদের ভূমিকা অপরিসীম। আধুনিক ব্যবস্থাপনা ও চা বাগানের জমির সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন দ্বিগুণ করা সম্ভব। আর এটি সম্ভব হলে আন্তর্জাতিক বাজারে কোটি কোটি কেজি চা রফতানি করা যাবে। যা দেশের অর্থনীতিতে এনে দিবে সমৃদ্ধি।

টেকসই উন্নয়নের জন্য চাই মালিক-শ্রমিক সুসম্পর্ক

টেকসই উন্নয়নের পূর্বশত মালিক-শ্রমিক সুসম্পর্ক। আজকের এই চলমান ধর্মঘট মালিক ও শ্রমিকের মাঝে চলে আসা দীর্ঘ দিনের শীতল সম্পর্কের উদাহরণ হয়ে থাকবে। চা উৎপাদনে সমৃদ্ধি আনতে হলে এর শ্রমিকদের গুরুত্ব দিতে হবে। শ্রমিকদের সাথে মালিকের সুসম্পর্ক স্থাপন করতে মৌলিক যেসব বাধা আছে সেগুলো দূর করতে হবে। শ্রমিকদের চাহিদাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। তাদের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, সন্তানদের শিক্ষাসহ মৌলিক অধিকার ও ন্যায্য দাবি মেনে নিতে হবে। কর্মক্ষেত্রে তাদের জন্য সুচিকিৎসা ব্যবস্থা করতে হবে। সময়ের সাথে তালমিলিয়ে সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে। স্বাধীনভাবে জীবন-যাপনের নিশ্চয়তা দিতে হবে। ভুলে গেলে চলবে না তারাও মানুষ। তাদেরও মানবাধিকার ও সমৃদ্ধ জীবন-যাপনের অধিকার রয়েছে। এটি বাস্তবায়ন করা গেলে শ্রমিকদের মন জয় করা সম্ভব হবে। এক্ষেত্রে সবার আগে মালিকদের এগিয়ে আসতে হবে। শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে মালিকদের পাশাপাশি রাষ্ট্রকে গুরুদায়িত্ব বহন করতে হবে। চলমান বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকট আমাদের দেশকে গভীর সংকটে ফেলে দিয়েছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে অসাধু কালোবাজারীদের দৌরত্ব। আজ সকল পেশার মানুষের জীবন খুব দুর্বিষহ অবস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। তাদের মধ্যে মেহনতি খেটে খাওয়া শ্রমিকদের অবস্থা আরও করুণ। শহরে কাজ করা একজন শ্রমিক অন্তত ৪০০-৫০০ টাকা রোজগারের সুযোগ পেয়েও সংসার চালাতে পারছে না। সেখানে এই যুগে একজন চা শ্রমিকের দৈনিক মজুরি কোনভাবে ১২০ টাকা হতে পারে না।

তাই এই মুহূর্তে দেশের স্বার্থে চা বাগানের মালিকদের উচিত চা শ্রমিকদের দাবি মেনে নেওয়া। তাদের পক্ষে ৩০০ টাকা মজুরি দেওয়া অসম্ভব নয়। শ্রমিকরা বাস্তবতা বিবর্জিত কোন দাবি পেশ করেনি। শ্রমিকদের দাবি যত দ্রুত মালিকরা মানবেন ততই তাদের জন্য মঙ্গলজনক হবে। এই ভরা মৌসুমে বাগানে প্রতিদিন কোটি কোটি টাকার চা পাতা নষ্ট হচ্ছে। এতে দিনশেষে মালিক ও রাষ্ট্র ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। শ্রমিকরা মালিকের কিংবা রাষ্ট্রের ক্ষতি করতে চান না। তারা তাদের পিঠ দেওয়ালে ঠেকে যাওয়া আজকের এই ধর্মঘটের ডাক দিয়েছেন। সুতরাং মালিক ও রাষ্ট্রকে এই বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে। শ্রমিক বাঁচলেই রাষ্ট্র বাঁচবে এই কথা ভুলে গেলে চলবে না।

শোষণের কালোছায়া দূরীভূত করে আসুক সূর্যের স্বাধীনতা

দেশের অধিকাংশ চা বাগান সিলেট বিভাগে। প্রতি বছর অসংখ্য পর্যটক 'দুটি পাতা একটি কুড়ির' মোহনীয়তায় মুগ্ধ হতে সিলেট ভ্রমণে আসেন। কিন্তু এই আজকের চলমান আন্দোলন যদি না সংঘটিত হতো তাহলে অনেকেরই জানা হতো না বাগানে কত বিষবাষ্প লুকিয়ে আছে। লুকিয়ে আছে কত কান্না, পাওয়া না পাওয়ার বেদনা, আধুনিক যুগে আদিম অন্ধকারে বসবাস করা একদল মানুষের কথা। যাদের জীবনে স্বাধীনতার সূর্যের উদয় ঘটে না।

যৎ সামান্য রেশন (সপ্তাহে ২ টাকা কেজি দরে ৩ কেজি আটা) ও ঝুপরি ঘর দিয়ে যাদের বুঝ দেওয়া হয় তোমাদের জন্য আমরা কত কিছু করছি। মাদকের নেশায় (বাংলা মদ) বুঁদ করে যাদেরকে অন্য দুনিয়ার বাসিন্দা করে রাখা হয়েছে। নেশার ঘোরে যারা ভুলে যায় মালিকদের সকল শোষণ-নিপীড়নের কথা। ভুলে যান সকল যন্ত্রণা ও বেদনায়ক স্মৃতি। চা শ্রমিকরা রাজধানী থেকে বহুদূরে বসবাস করে। তাই এই ঢাকা শহরে তাদের জন্য কেউ কণ্ঠ উচ্চকিত করে না। তাই চা শ্রমিকদের ওপর চলা শোষণ-নিপীড়ন আড়ালেই রয়ে গেছে যুগ যুগ ধরে। তাদের এই মানবেতর জীবন আর কাম্য নয়। শোষণের কালোছায়া দূরীভূত হয়ে তাদের জীবনে স্বাধীনতার সূর্য নেমে আসুক। দাসত্বের শৃঙ্খল ভেঙ্গে তারা হয়ে উঠুক এই সমাজ-রাষ্ট্রের মূলধারার জনগোষ্ঠী। তাদের সন্তানরা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে তাদের পিতা-মাতার সকল দুঃখ-কষ্ট ভুলিয়ে দিক। এটাই আমাদের প্রত্যাশা। চা শ্রমিকদের আজকের এই সংকট স্থায়ীভাবে দূর করতে রাষ্ট্রকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। তাদের ন্যূনতম মজুরি সুযোগ-সুবিধা আইন দ্বারা নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক দল, শ্রমিক সংগঠন, সুশীল সমাজ ও মালিকদের সময়ের বাস্তবতার আলোকে একটি সময়োপযোগী মজুরি বোর্ড ও চা শ্রমিকদের কল্যাণ বোর্ড গঠন করতে হবে। আজকের এই সংকট যেন আর গভীর না হয় এবং আমাদের যেন আর লিখতে না হয়, 'চা বাগানে এখনো সূর্য ওঠেনি।'

লেখক: সাংবাদিক ও কলামিষ্ট
mahmudashish@yahoo.com

যে অসহায় নারীর আর্তনাদে ওহী নাজিল হয়

রোজিনা আখতার

মহিলাটি রাসুল(সা) এর কাছে দৌড়ে এসে আরয করলেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ (সা) আমার স্বামী যিহার করেছে। আপনি এটা বাতিল করে দিন। আমার মাতা-পিতা আপনার উপর কুরবান হোক, আমার এবং আমার সন্তানদের জীবন ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচান। রাসুল (সা) বললেন, আমার ধারনা তুমি তার জন্য হারাম হয়ে গিয়েছো। (শরীয়তের বিধান তখনও আসেনি) নবী (সা) এর জবাব শুনে মহিলাটি কান্নাকাটি করতে লাগলেন এবং বার বার আরজ করতে লাগলেন, তালাক হয়ে গেলে আমি কোথায় যাব, আমার কি হবে? আমার ছোট ছোট বাচ্চাদের কি হবে? আমার মা বা আপনজনেরা কেউ নেই। আমার যৌবন শেষ হয়ে গিয়েছে। আমি আমার যৌবন তাকে দিয়েছি। তার সন্তান ধারণ করেছি। উনি বৃদ্ধ মানুষ আমি চলে গেলে কে তাকে দেখবে। আমার অর্থবিত্তও শেষ। যেভাবেই হোক এ তালাক বাতিল করে দিন। আমার স্বামীর বার্ধক্যের কারণে তার মেজাজে রুক্ষতা এসে গিয়েছিল, সে সামান্য কারণে রেগে বলে ফেলেছে। 'অবনতি আলাইনা কাজাহরি উম্মি' (অর্থাৎ তুমি আমার নিকট তেমন যেমন আমার মায়ের সৃষ্টদেশ) (সে যুগে এ ধরনের কাজকে বলা হল 'জিহার' এবং তালাকের মতই পরস্পর পরস্পরের জন্য হারাম হয়ে যেতো) এখন আমার স্বামী অনুতপ্ত, সে রাগান্বিত হয়ে একথা বলে ফেলেছে, আমি কসম করে বলছি এটা তালাক নয়। এমন কোন পথ বলে দিন যাতে আমার, আমার বৃদ্ধ স্বামী এবং সন্তানদের জীবন ধ্বংস হওয়া থেকে রক্ষা পায়। রাসুল (সা) নিরুপায়, কিছু বলতে পারলেন না, মাথা নামিয়ে নিলেন। মহিলাটি নিরাশ হলেন না, বারবার রাসুল (সা) কে রাজি করানোর চেষ্টা করলেন। অতঃপর টলটল চোখে তাকালেন আরশের মালিকের দিকে। পরম আস্থা নিয়ে হাত উঠালেন, আর হৃদয়গ্রাহী শব্দে গভীর আবেগ মিশ্রিত সুরে বললেন, ' হে মাওলা! আমি আপনার নিকট নিজের কঠিন মুসিবতের ফরিয়াদ করছি। হে আল্লাহ, যা আমাদের জন্য রহমতের কারণ হয়, তা নবীর (সা) মুখ দিয়ে প্রকাশ করুণ।'

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) বলেন, এ দৃশ্য এত করুণ ছিল যে, ঘরের সকল লোকের চোখ অশ্রুপূর্ণ হয়ে যায়। মহিলার হাত তুলে আর্তনাদ তখনও চলছিল। এ বেদনাহত আর্জিতে আল্লাহর রাব্বুল আলামিনের আরশ কেপেঁ উঠে, তার রহমতের দরজা ততক্ষণে খুলে যায়। রাসুল (সা) এর উপর ওহী নাযিলের অপার্থিব প্রভাব স্পষ্ট হয়ে উঠে। জিবরাইল (আ.) ওহী নিয়ে এলেন। মহিলাটিকে আয়েশা (রা) বললেন, হাত নামাও, ওহী এসে গেছে। রাসুলুল্লাহ (সা) তার মুক্তার দানার মত চকচকে ঘাম মুছতে মুছতে বললেন, 'খাওলা' তোমাকে মোবারকবাদ। আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা তোমার ফয়সালা করে দিয়েছেন।

অতঃপর তিনি সুরা মুজাদালা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করলেন। সুরাটির প্রথম চার আয়াতই হযরত খাওলার (রা) প্রসঙ্গে ছিল। পুরো নাম খাওলা বিনতে সালাবা (রা), আউস ইবনে আল সামিত (রা)এর স্ত্রী। মুজাদালাহ অর্থ সেই নারী যে কাতরভাবে অনুনয় বিনয় করে অথবা যে নারী বাদানুবাদ, তর্কাতর্কি করে। এই সেই নারী যে রাসুলের (সা) দরবারে ফয়সালার জন্য তর্কাতর্কি করেন অবশেষে কাতরকণ্ঠে আল্লাহর দরবারে ধর্না দেন বিচারের জন্য। ওহী না আসা পর্যন্ত বলেই যাচ্ছিলেন। অবশেষে সরাসরি আল্লাহর ফায়সালা পেয়ে ক্ষান্ত হন এবং সন্তুষ্ট হন।

অতঃপর এ সুরায় নাযিলকৃত নির্দেশ মুতাবিধ রাসুল (সা) খাওলাকে (রা) বললেন, তোমার স্বামীকে বল একটি গোলাম আযাদ করতে। খাওলা (রা) আরজ করলেন 'ইয়া রাসুলুল্লাহ, আমার স্বামীর কোন গোলাম নেই' রাসুল (সা) বললেন, "তাহলে সে অব্যাহতভাবে ৬০ দিন রোজা রাখবে"

খাওলা (রা) বললেন “হে আল্লাহর রাসুল (সা) আল্লাহর কসম, আমার স্বামী খুবই দুর্বল, সে যদি দিনে তিনবার খানা পিনা না করে তাহলে চোখে দেখতে পায় না। অব্যাহতভাবে ৬০ টি রোজা রাখা তার জন্য অসম্ভব ব্যাপার।” রাসুল (সা) বললেন ঠিক আছে, তাহলে তাকে ৬০ জন মিসকিনকে খাবার খাওয়াতে বল।

খাওলা (রা) বললেন “ হে আল্লাহর রাসুল (সা) আমার স্বামীর এরও সামর্থ নেই, আপনি যদি সাহায্য করেন” দয়ার সাগর রাসুল (সা) সাহায্য করলেন যা দিয়ে হযরত আওস (রা) বিন সামিত সাদাকাহ দিয়ে নিজের জিহারের কাফফারা আদায় করেন। সুরা মুজাদালা নাজিল হবার পর হযরত খাওলা (রা) মর্যাদা অনেক বেড়ে যায়। বড়ো বড়ো সাহাবারাও অনেক সম্মান দিতে লাগলেন, উমর (রা)তখন আমিরুল মুমিনীন মসজিদে বাহিরে খাওলা (রা) এর সাথে দেখা, উমর (রা) তাকে সম্মানের সাথে সালাম জানালেন, কুশল জিজ্ঞাসা করলেন, খাওলা (রা)ও ততদিনে বয়স হয়েছে কিন্তু উনার প্রগলভতা এতটুকু কমেনি। তিনি উমর (রা) কে বললেন, হে উমর তোমাকে আমি তখন থেকে চিনি যখন তুমি উকাজের মেলায় বাহিরে হাতে ছড়ি নিয়ে ভেড়া চড়াতে। এখন তোমার উপাধি আমিরুল মুমিনীন। তাই খলিফা হিসাবে আল্লাহকে ভয় কর। মানুষের দেখভালের দায়িত্ব এখন তোমার উপর এবং জেনে রাখো যে আখিরাতের শাস্তিকে ভয় করে সে যেন বুঝতে পারে সেইদিন বেশি দূরে না। আর যে মৃত্যুকে ভয় করে সে এই দুনিয়ার অনেক সুযোগ সুবিধা ছেড়ে দেয়।”

সাহাবি আল জারদ আল আবদি, উমর (রা) এর পাশেই ছিলেন, তিনি অবাক হয়ে বললেন “এই যে মহিলা, আপনি কিন্তু ভীষণ রুক্ষভাবে আমিরুল মুমিনীনের সাথে কথা বলছেন” জবাবে উমর (রা) বললেন, “তাকে বলতে দাও, জান না উনি খাওলা, যার কথা স্বয়ং আল্লাহ পাক সাত আসমানের উপর থেকে শুনেছেন। সে মোতাবেক উমর বাধ্য তার কথা শুনতে।”

অন্য আরেক দিনে এমনই এক ঘটনায় উমর (রা) বলেছেন, “উনি হলেন খাওলা বিনতে সালাবা, যার কথা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা সাত আসমানের উপর থেকে শুনেন, আল্লাহর কসম যদি না সে আমাকে রাত নেমে আসার আগ পর্যন্ত না ছাড়ে, আমি ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে যেতে বলবো না, যদি না নামাজের সময় হয়ে যায় এবং আমাকে নামাজ পড়তে যেতে হয় তবে আমি নামাজ পড়ে আবার তার কাছেই ফিরে আসবো যতক্ষণ না যে কাজে সে আমার কাছে এসেছে তা পূরণ হয়।

এতো সেই মহিলার যার ব্যাপারে ‘কাদ সামিয়াল্লাহু’ নাযিল হয়েছে।

লেখক: কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদিকা
বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

বাংলাদেশের স্টিল ও রি-রোলিং শিল্প দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে

মোঃ আবুল হাসেম

স্টিল ও রি-রোলিং সেক্টর মানব সভ্যতার সামগ্রিক অবকাঠামোগত উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। পৃথিবী সৃষ্টি হতে অদ্যাবধি পৃথিবীতে অবকাঠামোগত যত উন্নয়ন হয়েছে তার পিছনে রয়েছে স্টিল ও রি-রোলিং শিল্পের অবদান। স্টিল ও রি-রোলিং মিল হল রোলিং মিল শিল্পে ব্যবহৃত স্টিল রি-রোলিং মিলগুলোর মধ্যে একটি। যেগুলো বিভিন্ন ধরনের ধাতববস্তুকে পছন্দসই আকার, বেধ, ঘনত্ব এবং বক্ররেখা দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়। এগুলি প্রধানত ইস্পাত, তামা, লোহা, অ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদি থেকে তৈরি পণ্যগুলি রোল বা প্রক্রিয়াজ্জাত করতে এবং সেগুলিকে বার, বিম, কোন, চ্যানেল, রড, প্লেট পছন্দসই আকার এব বেধে রূপান্তর করতে ব্যবহৃত হয়। স্টিল রি-রোলিং মিলগুলি ব্যাপকভাবে রোলিং মিল প্লান্ট, সিমেন্ট শিল্প উপাদান, হ্যান্ডেলিং শিল্প, ইস্পাত কারখানা, খনি শিল্প, সার শিল্প, পাওয়ার প্লান্ট, স্পঞ্জ আয়রণ শিল্প এবং সংশ্লিষ্ট খাতে নিযুক্ত হয়।

আকৃতির উপর ভিত্তি করে ইস্পাত শিল্পকে ৩টি ভাগ করা হয়েছে। টিএমটিবার, ফ্ল্যাট স্টিল এবং স্টেইনলেস স্টীল। টিএমটি বারগুলি অত্যন্ত শক্তিশালী এবং এই শক্তিবৃদ্ধি বারগুলি তাদের কমক্ষয়ের কারণে নির্মাণ শিল্পে সবচেয়ে জনপ্রিয়। ফল স্বরূপ বিশ্বের বেশির ভাগ উন্নয়নশীল দেশের নির্মাণ কাজে শুধুমাত্র টিএমটি বার ব্যবহার করা হয়। বাংলাদেশে টিএমটি বারগুলি সাধারণ শক্তিশালী কংক্রিট কাঠামো, সেতু এবং ফ্লাইওভার, বাঁধ, তাপ ও জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র, শিল্প কাঠামো এবং উঁচু ভবন গুলোতে ব্যবহৃত হয়।

ফ্লাট স্টিল গুলো প্রধানত স্বয়ং চালিত শিল্প, গৃহস্থালী যন্ত্রপাতি, জাহাজ নির্মাণ এবং নির্মাণ খাতে ব্যবহৃত হয়। স্টেইনলেস স্টিলগুলো সাধারণ নির্মাণ, রান্নঘরের জিনিসপত্র এবং চিকিৎসা সরঞ্জামসহ অন্যান্য খাতে ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশে সরকারি খাতে ৬০ শতাংশ স্টিল ব্যবহৃত হয়। ২৫ শতাংশ গৃহস্থালীতে এবং ১৫ শতাংশ বানিজ্যিক নির্মানে ব্যবহৃত হয়।

বাংলাদেশে ইস্পাত শিল্পের গোড়াপত্তন হয় চট্টগ্রামের নাসিরাবাদ এলাকায়। প্রথম ইস্পাত কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫২ সালে। এইটির নাম ছিল ইস্ট বেঙ্গল স্টিল রি-রোলিং মিলস। স্বাধীনতার পরে নাম বদলে হয় বাংলাদেশ স্টিল রি-রোলিং মিলস বা বিএসআরএম। এটি ছিল দেশে প্রথম ইস্পাত তৈরির কারখানা। ভারতের গুজরাটের বাসিন্দা আকবর আলী আফ্রিকাওয়ালা প্রথম চট্টগ্রামের নাছিরাবাদে এই শিল্প প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে তার ছেলে আলী হোসাইন বাংলাদেশের ইস্পাত শিল্পের আধুনিক ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের দিকে নজর দেন। গড়ে তুলেন বাংলাদেশ স্টিল রি-রোলিং মিলস বা বিএসআরএম।

এরপর ধীরে ধীরে এ শিল্প চট্টগ্রামসহ সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৬০ সালের দিকে সরকারিভাবে পতেঙ্গা এলাকায় বাংলাদেশে প্রথম সরকারি ইস্পাত কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। এইটির নাম ছিল চিটাগাং স্টিল মিলস। পূর্ব পাকিস্তানের সামগ্রিক ইস্পাতের চাহিদা বিবেচনায় রেখে তৎকালিন পাকিস্তান সরকার এটি প্রতিষ্ঠা করে। কারখানাটি বানিজ্যিক উৎপাদনে যায় ১৯৬৭ সালে।

ইস্পাত কারখানাটির বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ছিল প্রায় দেড় লাখ টন। যদিও ১৯৯৯ সালের জুলাই মাসে কারখানাটি বন্ধ ঘোষণা করা হয়। পরবর্তীতে ধীরে ধীরে চট্টগ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয় আবুল খায়ের স্টিল, জিপিএইচ ইস্পাত, রতনপুর স্টিল রি-রোলিং মিলস, কবির স্টিল রি-রোলিং মিলস। গোল্ডেন ইস্পাত, শীতলপুর অটো স্টিল মিলস, এইচ এম স্টিল, বায়েজিদ স্টিল, সীমা স্টিল, পিএইপি ইন্টিগ্রেটেড মিল ইত্যাদি। এইসব কারখানাই দেশের ইস্পাত খাতের রড উৎপাদনের প্রায় ৭০ শতাংশ চাহিদা পূরন করে। বর্তমানে চট্টগ্রামসহ সারাদেশে দ্রুত বিকাশ মান হচ্ছে ইস্পাত শিল্প। বাংলাদেশে যে পরিমাণ ইস্পাত তৈরি হয় তার ৭০ শতাংশ চট্টগ্রামে উৎপাদন হয়। আমাদের দেশের স্টিল মিলগুলোতে বিশ্বের সর্বোচ্চ উন্নতমানের প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। দেড়যুগ আগেও এদেশে রড আমদানি করা হতো। এখন সেই চিত্র পাল্টে গেছে। বাংলাদেশ থেকে এখন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রড রপ্তানি হচ্ছে। দেশের সবগুলো মেগা প্রকল্পসহ পদ্মা সেতু, টানেল নির্মাণেও দেশের তৈরি রড ব্যবহার করা হচ্ছে। মূলত সরকারি বেসরকারিভাবে অব কাঠামোগত উন্নয়নের

ফলে ১৯৯০ সালের পর থেকে দেশের লৌহ-শিল্পের প্রবৃদ্ধি ঘটেছে। চট্টগ্রাম বন্দর কেন্দ্রিক যোগাযোগ ব্যবস্থাকে ঘিরে এই অঞ্চলে শিল্পের বিপ্লব ঘটে। বর্তমানে চট্টগ্রামে প্রায় ১০টির মতো অটোমেটিক স্টিল ও সনাতনী স্টিল মিল রয়েছে প্রায় ২০টি।

ইস্পাত পণ্য প্রস্তুত কারক সমিতি ও উদ্যোক্তাদের তথ্য অনুযায়ী ১০ বছর আগেও দেশে বছরে সম্মিলিতভাবে এস এস রড উৎপাদন হতো ২৫ লাখ টন। বর্তমানে চাহিদা অনুযায়ী বছরে গড়ে উৎপাদন ও বাজারজাত হচ্ছে প্রায় ৬০ লাখ টন। যদিও বর্তমানে কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের কারখানা সম্প্রসারণ পদক্ষেপ ইস্পাতের (রড) সম্মিলিত উৎপাদন সক্ষমতা এখন ৯০ লাখ টনে উন্নীত হয়েছে। কারখানার সক্ষমতা যে গতিতে সম্প্রসারণ করা হচ্ছে তাতে আগামী বছরে অর্থ্যাৎ ২০২৩ সালে এক কোটিমেট্রিক টনে উন্নীত হবে। এখানে উদ্যোক্তাদের মোট বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় ৫০ হাজার কোটি টাকা। বর্তমানে প্রায় ১০ লক্ষ মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এই শিল্প সেক্টরে জড়িত হয়েছে।

৬ কোটি ৩৫ লাখ শ্রম জনশক্তির বাংলাদেশে ৪৩টি সেক্টরে মজুরী বোর্ড আছে। রি-রোলিং স্টিল মিলস তার মধ্যে অন্যতম। কিন্তু বাংলাদেশে শ্রমিকদের সবচেয়ে কষ্টকর এবং সবচেয়ে অবহেলিত সেক্টরের নাম স্টিল রি-রোলিং মিলস। ৪ শতাধিক ছোট বড় রি-রোলিং ও স্টিল মিলে প্রায় ২ লাখ শ্রমিক কী কঠোর পরিশ্রম ও ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশে কাজ করে। বাংলাদেশে রডের চাহিদা গড়ে ৮০ লাখ টন। এর অধিকাংশই তৈরি হয় রি-রোলিং সেক্টর থেকে। আমাদের দেশে আকরিক বা ক্র্যাপ থেকে লৌহার চাহিদা মেটানো হয়। লৌহা দ্বারা প্রয়োজনীয় দ্রব্য তৈরির জন্য লৌহাকে গলিয়ে বিভিন্ন আকৃতি দিতে হয়। ১৫৩৮ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় লৌহা গলানো হয়। ফলে যে ফার্নেস লৌহা গলানোর কাজ হয় তার বাইরে ৬০-৬৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপ থেকে। স্বাভাবিকভাবে আমরা দেখি ৩৫-৩৬ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় কাজ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। সেখানে ৬০-৬৫ ডিগ্রি তাপমাত্রায় কী কঠিন পরিস্থিতি হয় তা অনুমান করাও কষ্টকর।

রি-রোলিং সেক্টরটা প্রচলিত অন্যান্য শিল্পকারখানা থেকে একটু ভিন্নতর। কারখানায় কর্মঘন্টার ধরন, ঝুঁকি ও পরিবেশের ম্যানুয়াল চালিত কারখানায় একজন শ্রমিক ৪৫ মিনিট কাজ করে ১৫ মিনিট বিরতি নিয়ে ২ ঘন্টা কাজ করে। প্রচন্ড গরম ও পরিশ্রমের কাজ বলে শ্রমিকদের দরদর করে ঘায়ের ঘাম ঝরতে থাকে।

শ্রম আইনে উল্লেখ থাকলেও অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য বেশিরভাগ কারখানায় শ্রমিকদের নিয়োগপত্র বা পরিচয়পত্র নেই। ৫ বছর পরপর মজুরি ঘোষণা করার আইন থাকলেও রি-রোলিং সেক্টরে ২০১১ সালের পর গত ২০২০ সালের ২৮ জুন শ্রমিকদের জন্য যে মজুরী কমিশন ঘোষণা করা হয় তাতে শ্রমিকদের প্রত্যশা অনুযায়ী হয়নি। এই কমিশনে ন্যূনতম সর্বোচ্চ মজুরি ১২৪০০ টাকা এবং ন্যূনতম সর্বনিন্মমজুরী স্কেল ৫৯০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়। এতে রি-রোলিং মিলের শ্রমিক কর্মচারীরা সারাদিন রাত শরীরের ঘাম ঝরিয়ে অনাহারে অর্ধাহারে, জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়। অন্যদিকে অস্বাস্থ্যকর ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করতে গিয়ে শ্রমিকরা অকালে মৃত্যুমুখে ধাবিত হয়। যে কোন অবকাঠামো অভ্যন্তরে যেমন লৌহা থাকে তেমনি উন্নয়ন ও উৎপাদনের অভ্যন্তরে আছে শ্রমিকদের শ্রম এবং ঘাম। কিন্তু এর মূল্য ও স্বীকৃতি দুটো থেকেই বঞ্চিত শ্রমিকরা। রি-রোলিং শ্রমিক কর্মচারীদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে নিন্মের সমস্যাসমূহ সমাধান করা একান্ত প্রয়োজন।

১. রি-রোলিং মিলে কর্মরত প্রত্যেক শ্রমিকের নিয়োগপত্র, পরিচয়পত্র প্রদান করা।

২. পে-স্কেল শিপ ব্রেকিং শ্রমিকদের মজুরি এবং বাজারদরের সাথে সংগতি রেখে নূন্যতম মজুরি নির্ধারণ করা।

৩. রি-রোলিং মিলে শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার দিতে হবে, যাতে ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ মালিকদের সাথে বসে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

৪. কর্মস্থলে নিরাপত্তা, আজীবন আয়ের সমান মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ, আহতদের চিকিৎসা ও পূনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।

৫. শ্রমিকদের জন্য সরকার কর্তৃক রেশনের ব্যবস্থা করতে হবে।

স্টিল রি-রোলিং সেক্টরে অন্যতম চ্যালেঞ্জ হল অপর্যাপ্ত কাঁচামাল। বাংলাদেশে ইস্পাত উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামাল এখনো আমদানি করতে হয়। বর্তমানে দেশে কর্মরত শিপ ব্রেকিং শিল্পের মালিকগণ ইস্পাত শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল যথেষ্ট পরিমাণে সরবরাহ করতে পারছে না। ফলে এই অত্যাবশ্যকীয় কাঁচামাল আমদানি করা খুবই কষ্টসাধ্য এবং সময় সাপেক্ষ কাজ যা বেশ চ্যালেঞ্জিং। কাঁচা মালের ঘাটতি এবং উচ্চ মূল্যের কারণে অনেক রি-রোলিং মিল বর্তমানে বন্ধ হয়ে আছে। ফলে এই শিল্পে কর্মরত হাজার হাজার শ্রমিক বেকারত্বের কারণে অনাহারে অর্ধহারে দিনাতিপাত করছে। সরকারের নীতি এবং প্রবিধান পরিবর্তনের ফলে রি-রোলিং শিল্পে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ননীতি প্রায়ই শুল্ক আইন, আয়কর, মূল্য সংযোজন কর অথবা অন্যান্য নিয়ন্ত্রন সংস্থার ক্ষেত্রে অপ্রত্যাশিত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যায়। এই ধরনের নীতি পরিবর্তনের ফলে রি-রোলিং সেক্টর বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়। কাঁচামালের ঘাটতি পূরণে দিনাজপুরে লৌহ আকরিকের রিজার্ভের সন্ধান পাওয়ায় আশার সঞ্চার হয়েছে। দিনাজপুরে এই নতুন লৌহ আকরিকের উৎসের সন্ধান নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে যা আগামী ৩০ বছরের জন্য লৌহা আকরিক সরবরাহ করতে পারে।

বাংলাদেশের ইস্পাত শিল্পের বিকাশের জন্য অভ্যন্তরীণ উৎপাদন এবং মূলধনী পণ্য ক্রয় বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। তাছাড়া বাংলাদেশের ইস্পাত খাতে গবেষণা ও উন্নয়নের উল্লেখযোগ্য ঘাটতি রয়েছে। যা পূরণ করা হলে প্রবৃদ্ধি আরও বাড়বে। দক্ষ শ্রমের বিকাশকে কাজে লাগিয়ে এবং সেক্টরে কর্মরত শ্রমিক কর্মচারীদের যাবতীয় সমস্যার সমাধান করতে পারলে দেশের সামগ্রিক উৎপাদনশীলতা বাড়ানো সম্ভব। উপরন্তু ইস্পাত শিল্পের শ্রমশক্তির নিরাপত্তা ও কল্যাণ নিশ্চিত করা আজ সময়ের দাবী।

লেখক: সভাপতি, বাংলাদেশ ব্যক্তিমালিকানাধীন স্টিল রি-রোলিং শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন

শ্রমিক শ্রেণির মাঝে মাদকের ভয়ানক সয়লাব

মুহাম্মদ হাফিজুর রহমান

প্রচণ্ড খড়তাপে কিংবা বাদলা দিনে রাস্তার ধারে ঝুপড়ি ঘরের আশে পাশে এক দল ছেলে-মেয়ের কিচির মিচির চিৎকার, অদূরে ইট ভাঙ্গতে থাকা নারীর ঘর্মাক্ত দৃশ্য। কালো পিচের রাস্তায় শাই শাই করে চলা গাড়ির জন্য কার্পেটিংয়ের কাজে ব্যস্ত নারী। সূর্যোদয়ের পূর্বে টিফিন ক্যারিয়ার হাতে ছুটে চলা মানুষগুলো আবার দিন শেষে রাত করে ফেরা মানুষগুলোর প্রশান্তির ঘুমের পরিবর্তে কোনো কোনো নীড় যেন শান্তির বদলে অশান্তির দাবানল হয়ে ওঠে। সারাদিনের খাটুনির পর সন্ধ্যা নামার সাথে সাথে সারি সারি ছোট টিনের ঘরের জানালা ভেদ করে আসা নারীর চিৎকার। নগর জীবনে এগুলো আমাদের অনেকের কাছেই চিরচেনা। প্রচণ্ড খড়তাপে শরীর পুড়িয়ে ছাই করা নারীর সারাদিনের পরিশ্রমের অর্থগুলো দুমুঠো চালের পরিবর্তে মাদকাসক্ত স্বামীর হাতে চলে যায় অনায়াসে। ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাধ্য হয়েই তারা যেন আত্মসমর্পণ করে মাদকাসক্ত স্বামী নামক এক জালেম পুরুষের কাছে। সময়ের বিবর্তনে এখন শুধু পুরুষ নয়, নারীরাও অনেক ক্ষেত্রে মাদকের সাথে জড়িয়ে পড়ছে। তবে শ্রমিক শ্রেণির নারীদের মাঝে এর প্রবণতা কিছুটা কম হলেও মাদক ব্যবসায়ে বস্তিকেন্দ্রীক নারীদের বিরাট একটি জগৎ গড়ে উঠেছে। মাদক এবং মাদকাসক্ততার প্রশ্ন যখন আমাদের সামনে আসে তখন শুধু তরুণদের কথাই চলে আসে। তরুণ মানে একদল শিক্ষিত কিংবা অর্ধশিক্ষিত তরুণকে নিয়ে আমাদের ভাবনাগুলো ঘুরপাক খায়। কিন্তু জীবনের রক্ত পানি করা পরিশ্রমের অর্থগুলো অনায়াসে মাদক কেনার কাজে ব্যয় করে জীবন এবং সংসার দুটোই নষ্ট করে চলেছে একদল শ্রমিক। হ্যাঁ অবশ্যই এ শ্রমিকরা জীবনের শুরুতে যখন মাদকের নেশায় ডোবা শুরু করে তখন তারা তরুণই থাকে। তবে বাস্তবতা হচ্ছে শ্রমিক শ্রেণির মাঝে মাদকসক্ততা কোনো বয়স মানছে না। আজকের নিবন্ধে আমি শ্রমিকদের মাঝে মাদকের বিস্তার নিয়েই কথা বলবো।

ট্রেনের চাকার ঘর্ষণের শব্দগুলো যখন কারো কাছে বিরক্তিকর মনে হয় তখন তারই পাশে মনের সুখ মেটাতে দেখা যায় এক দল পুরুষ কিংবা মধ্য বয়সী কাপুরুষদের। জীবনের সব সুখ যেন ওরা খুঁজে পায় মাদকের এক চুমুকেই। রাজধানীর কারওয়ান বাজার বস্তি কিংবা রেল লাইন ধরে হাঁটতে থাকুন, আপনি দেখা পাবেন অসংখ্য মাদকসেবী আর মাদক বিক্রেতার। তাদের চোরা চাহনি আর লুকোচুরি বলে দেবে কোন অপরাধ প্রবণতায় তারা এখানে ব্যস্ত। মাদক কারবারী, মাদকসেবী আর এর ব্যবসায়ীদের অধিকাংশের বসবাস এক সময় শহরের বস্তি এবং নিম্ম এলাকায় থাকলেও তা এখন গ্রাম পর্যন্ত ছড়িয়েছে। অপরাধী আর পুলিশের লুকোচুরি খেলা, খালি চোখে ধরা পড়ে অনেকের কাছেই। মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদফতরের প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী রাজধানীতে পাঁচশরও বেশি মাদক স্পট রয়েছে। এসকল স্পটগুলো মাদক বিক্রেতা, মাদকসেবী, সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজদের অভয়ারণ্য হিসেবে পরিচিত।

শহর থেকে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে মাদকের বিস্তার জালের মতো ছড়িয়ে পড়েছে। এক সময় মাদক অর্থে শুধু মদ, গাজা, ভাঙ্গ, মরফিন, কোকেন, আফিম এগুলোই বোঝাতো। দিন যতো যায় মাদকের প্রকার এবং নামে ভিন্নতা এনে নিত্য নতুন মাদক সামগ্রী বাজারে আনে মাদক ব্যবসায়ীরা। হিরোইন, ফেনিসিডিল, ইয়াবা ইত্যাদির সাথে মাদকের নিত্য নতুন প্রোডাক্ট বাজারে আনছে অসাধু ব্যবসায়ীরা। তবে শ্রমিক শ্রেনির মাঝে তারি, মদ, ফেনিসিডিল, ইয়াবা এবং গাজার ব্যবহার বেশি হয়। রাজধানীর অধিকাংশ বস্তি মাদকসেবী এবং ব্যবসায়ীদের মূল আখড়া। অধিকাংশ রিক্সা গ্যারেজ, বাস স্ট্যান্ড, ট্রাক স্ট্যান্ড এবং শ্রমিক মেসগুলোতে মাদকসেবীদের আড্ডা চলে দিন-রাত সব সময়। এতে যেমন পাড়া-মহল্লার মাস্তান, চাঁদাবাজ আর সন্ত্রাসীরা আছে একইভাবে তাদের সাথে সঙ্গী হয় বিভিন্ন পেশার শ্রমিকরা। সারাদিন পরিশ্রম করে যে কয়টা টাকা উপার্জন করে মাদক সেবনে সেই টাকা ব্যয় করে গভীর রাতে খালি হাতে বাসায় ফেরে। ফলে এদের অধিকাংশের পরিবারে সব সময় অশান্তি লেগেই থাকে। ফলে পারিবারিক ভাঙ্গন অপরিহার্য হয়ে ওঠে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এদের সন্তানদের লেখাপড়া হয় না, সন্তানগুলো বখে যায়।

শ্রমিক শ্রেণির বড়ো একটি অংশ মাদকের সাথে জড়িত হয়ে পড়ার কারণে তারা অল্প বয়সে কর্ম-অক্ষম হয়ে পড়ে। জীবন সম্পর্কে একদিকে যেমন তারা হতাশায় ভোগে, একইভাবে পরিবার, সংসার,

স্ত্রী, সন্তান কারো প্রতি তাদের কোনো আকর্ষণ এবং ভালোবাসা থাকে না। পরিবহন সেক্টরের শ্রমিকদের বড়ো একটি অংশ মাদক সেবনের সাথে এমনভাবে জড়িয়ে যায় যে তারা এঁকে জীবনের অন্যতম অনুসঙ্গ মনে করে। মহাসড়কগুলোতে দুর্ঘটনার অনেকগুলো কারণের মধ্যে এটাও একটি কারণ যে ট্রাক ড্রাইভার, হেলপার এবং বাস চালকদের একটি বড়ো সংখ্যার মাঝে মাদকাসক্ততা। একজন পরিবহন শ্রমিক প্রতিদিন যা আয় করে তাতে একটি নিম্নবিত্ত আয়ের সংসারের অতি প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো সহজে মেটানো সম্ভব। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, তাদের পারিবারিক জীবনে যেমন শান্তি নেই, তেমনি অর্থ কষ্ট, খাদ্য কষ্ট লেগে থাকে সারা বছর। অর্থাভাবে সন্তানদের লেখাপড়ার কথা তাদের অনেকেই চিন্তাও করে না। মাদকাসক্ত না হয়ে পরিচ্ছন্ন জীবন যাপন করলে তাদের জীবন কত সাবলীলভাবে চলে যায়। কিন্তু এ বোধ এবং বুদ্ধি তখনই লোপ পায় যখন তারা মাদকের রাজ্যে ডুবে যায়।

মাদক এক নীরব ঘাতকের নাম। একজন মানুষের জীবনের সকল চাওয়া পাওয়া বিনাশ করে দেয় মাদকাসক্ততা। মাদক গ্রহণের ফলে একজন ব্যক্তির স্বাস্থ্যহানিই শুধু হয় না, তার সকল প্রকার আগ্রহ উদ্দীপনা নিঃশেষ হয়ে যায়। জীবনীশক্তি হ্রাস পায়, শরীরের ইন্দ্রিয়গুলো তাকে সহায়তা করার পরিবর্তে বিরূপ আচরণ করে। চারপাশের মানুষের সাথে তার আচরণ হয় চরম অভদ্রজনিত। মানসিক ভারসাম্যহীন হয়ে সে এমন সব অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ করে যা তার চারপাশের মানুষেরা কল্পনা করে না। নিজ পেশায় জড়িত থাকলেও শুধু মাদকের জন্যই তখন অর্থের অনুসন্ধান করে। শ্রমিক শ্রেণির মাঝে এর যে বিরূপ প্রভাব দেখা দেয় তার প্রতিক্রিয়া হয় অত্যন্ত ভয়াবহ। নিজ সংসার সন্তান সব কিছুর দায়িত্ব পালন করা থেকে বিরত থাকে। স্ত্রী-সন্তানদের ওপর শারিরীক নির্যাতন করে। নিজে উপার্জন করার পরিবর্তে অনেক সময় স্ত্রীকে দিয়ে অমানুষিক পরিশ্রম করিয়ে তার উপার্জিত অর্থ হাতিয়ে নেয় মাদক সেবনের জন্য। মাদকের জন্য স্ত্রীকে হত্যার মতো ভয়াবহ ঘটনাও আমরা মাঝে মাঝে বিভিন্ন গণমাধ্যমে মাধ্যমে দেখি। এমনকি মাদকের অর্থের জন্য নিজ পিতা-মাকে হত্যার মতো ঘটনাও অহরহ ঘটছে।

অশিক্ষা, অজ্ঞতা, জীবনের উদ্দেশ্যহীনতা আর শৃঙ্খলাহীন জীবনাচার তাদেরকে অতি সহজে মাদক আর নেশার দিকে নিয়ে যায়। শ্রমিক শ্রেণির বিরাট একটি অংশের বসবাস এমন এক পরিবেশে যেখানে অতি সহজেই মাদকের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। অতি দরিদ্র পরিবারের সন্তান, যাদের অধিকাংশের জীবনের শুরুতে কোনো শিক্ষার আলো পায় না, পারিবারিকভাবে কোনো নৈতিক শিক্ষা যাদের জীবনে ঘটে না এমন এক বিপুল সংখ্যক শিশু জীবন শুরু করে কঠিন পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে। তারা জীবনের শুরুতেই পূতিগন্ধময় এক অন্ধকার পরিবেশের সাথে পরিচিত হয়ে যায় অতি সহজে। সমাজের নানা অসঙ্গতি, অন্যায় অনাচার, অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ, বৈষম্য এবং মানসিক ও শারিরীক নির্যাতন তাদেরকে মাদকের পথে ঠেলে দেয়। শ্রমিকদের অনেকেই বাধা-বন্ধনহীন জীবন যাপনে অভ্যস্ত। অতি সহজে তারা হাতের নাগালে মাদক পেয়ে যায়। সাংবাদিক, মাদক দ্রব্য অধিদপ্তর এবং পুলিশের তথ্য যা গণমাধ্যমে এসেছে তাতে দেখো গেছে, মাদক

অশিক্ষা, অজ্ঞতা, জীবনের উদ্দেশ্যহীনতা আর শৃঙ্খলাহীন জীবনাচার তাদেরকে অতি সহজে মাদক আর নেশার দিকে নিয়ে যায়। শ্রমিক শ্রেণির বিরাট একটি অংশের বসবাস এমন এক পরিবেশে যেখানে অতি সহজেই মাদকের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। অতি দরিদ্র পরিবারের সন্তান, যাদের অধিকাংশের জীবনের শুরুতে কোনো শিক্ষার আলো পায় না, পারিবারিকভাবে কোনো নৈতিক শিক্ষা যাদের জীবনে ঘটে না এমন এক বিপুল সংখ্যক শিশু জীবন শুরু করে কঠিন পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে। তারা জীবনের শুরুতেই পূতিগন্ধময় এক অন্ধকার পরিবেশের সাথে পরিচিত হয়ে যায় অতি সহজে। সমাজের নানা অসঙ্গতি, অন্যায় অনাচার, অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ, বৈষম্য এবং মানসিক ও শারিরীক নির্যাতন তাদেরকে মাদকের পথে ঠেলে দেয়।

ব্যবসায়ের মূল কারিগররা মাদকদ্রব্য ধরে না, ছুঁয়েও না, তারা কেবল মধ্যস্থানে অবস্থানকারী লোকের মাধ্যমে মাদক ব্যবসায় কোটি কোটি টাকা পুঁজি বিনিয়োগ করে। তারা নিজে যেমন মাদকে সেবন থেকে দূরে থাকে নিজ পরিবার এবং সন্তান সন্ততিকেও এ থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করে সব সময়। পুঁজি বিনিয়োগ করে লাভসহ তা উত্তোলন করাই তাদের কাজ। এ জন্য তারা কয়েকটি স্তরের সরবরাহকারী ও বিক্রেতা নিয়োগ করে। সীমান্ত এলাকা হতে দেশে আনা, পথে পথে হাত বদল, নিরাপদ স্থানে রাখা তা মাঠ পর্যায়ের বিক্রেতার কাছে পৌঁছানোর জন্য তারা এক সুবিশাল চেইন রক্ষা করে। তাই তারা বরাবরই ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকে। মধ্যস্থানীয় ব্যবসায়ীরাও পর্দার আড়ালে থেকে সুকৌশলে মাদক ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করে। তারাই প্রশাসন ও রাজনৈতিক রাঘব বোয়ালদের ম্যানেজ করে। মাঠপর্যায়ে বিপণনের ব্যবস্থা করে স্থানীয় পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতারা। তারাই সব সময় পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়। কয়েকদিন জেল খেটে আবার এ পেশায় ফিরে যায়। মাঠ পর্যায়ের ক্রেতাদের অধিকাংশই শ্রমিক শ্রেণির এবং বিক্রেতারাও দারিদ্র এবং নির্দিষ্ট পেশায় কাজ করতে না পারার কারণে এদিকে ঝুঁকে পড়ে।

মাদক বিক্রির স্পট এবং মাদক ব্যবসায়ীদের তালিকা প্রশাসনের কাছে আছে, তারা জানে কারা কোথায় মাদক বিক্রি করে। মাঝে মাঝে পুলিশ অভিযান চালিয়ে গ্রেফতারও করে। কিন্তু মাদক ব্যবসা এবং এর ব্যবহার কোনোভাবেই বন্ধ হচ্ছে না। সারাদেশে মাদক সরবরাহের বিভিন্ন রুট থাকলেও সীমান্ত হতে মাদক প্রথমে রাজধানীতে আসে, এখান হতে আবার সারাদেশে জালের মতো ছড়িয়ে থাকা তাদের নির্দিষ্ট পথে এগুলো মাঠ পর্যায়ে সরবরাহ করে। রাজধানীতে মাদক প্রবেশের মূল রুট হচ্ছে গাবতলী, টঙ্গীর আবদুল্লাহপুর, নারায়ণগঞ্জের কাঁচপুর এবং তারাবো। রাজধানীর উল্লেখযোগ্য মাদক বিক্রি এবং সরবরাহের মূল স্পটগুলো বড়ো বড়ো বস্তি কেন্দ্রীক। টঙ্গীর দত্তপাড়া, মহাখালী সাত তলা বস্তি, কারওয়ান বাজার, বাড্ডা-ভাটারা, মালিবাগ, মগবাজার বস্তি, চনপাড়া, নামাপাড়া, বুড়িগঙ্গা ব্রীজের পাশ ঘেষা বস্তি, আশুলিয়া বেড়িবাঁধ মাদক সরবরাহের মূল স্পট। এর বাইরে ঢাকা শহরে কমপক্ষে হাজার খানেক স্পটে মাদক কেনাবেচা হচ্ছে নিয়মিত। এ সকল স্পটে মূলত শ্রমিক শ্রেণির মানুষগুলোই বসবাস করে। রাত বাড়ার সাথে এ সকল বস্তি এবং এলাকাগুলোতে অন্য রকমের এক পরিবেশ তৈরি হয়। যারা মাদক ও নেশা হতে দূরে থাকতে চায় অনেক সময় তাদের পক্ষে এ থেকে দূরে থাকা সম্ভব হয় না। অল্প আয়ের দরিদ্র মানুষগুলো যেখানে বসবাস করে মাদকসেবীরা সেই স্থানকেই তাদের সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা মনে করে। কোনো রকম বেঁচে থাকার তাগিদে তারা অসহায়ের মতো এগুলো সহ্য করে। অতি কষ্টে কেউ মাদকের ছোবল থেকে বেঁচে থাকতে পারে আবার কেউ এর শিকারে পরিণত হয়। যার কারণে শ্রমিক শ্রেণির মাঝে মাদক গ্রহণের প্রবণতা বেশি।

মাদক ব্যবসা নিয়ন্ত্রণে অনেক সময় দেখা যায় পুরুষের চেয়ে নারীরাও কম নয়। কারণ পুরুষ মানুষকে যতো সহজে সন্দেহ করা হয় নারীদের ততো সহজে সন্দেহ করা হয় না, তাকে তল্লাশী করার কাজটি সহজ নয়। এ জন্য মাদক ব্যবসায়ে পুরুষের সাথে নারীরাও সমানতালে এ ব্যবসায়ে জড়িত। মিডিয়ার পাতায় বার বার নাম আসা মাদক সম্রাজ্ঞী মোমেলা বেগম থাকেন বস্তিতে কিন্তু তিনি চারটি বহুতল ভবনের মালিক। প্রতিবার গ্রেফতার হওয়ার পর জামিনে মুক্ত হয়ে আবার সোজা চলে যান বস্তির আখড়ায়। বর্তমানে কারাগারে আটক যুবলীগ নেত্রী পাপিয়ার পাপের কথা সবারই জানা। এমন শত পাপিয়ার রাজত্ব রয়েছে মাদক সিন্ডিকেটের অভ্যন্তরে। রাজধানীর গোপীবাগের আয়েশা, গুলশানের মাদক সম্রাজ্ঞী মৌ, রিনা, ন্যান্সি, কুমকুম ও বানু সম্পর্কে বিভিন্ন মিডিয়ায় বার বার সংবাদ এসেছে। তেজগাঁও এলাকার মাদক সিন্ডিকেটের নিয়ন্ত্রণও ৪/৫জন মাদক সম্রাজ্ঞীর হাতে। অভিজাত এলাকা বনানীর মাদক সিন্ডিকেট নিয়ন্ত্রণ করে আইরিন ওরফে ইভা, উত্তরার গুলবাহার, নাদিয়া ও মাহমুদা। রাজধানীর টিএন্ডটি সংলগ্ন কড়াইল বস্তির ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করে রিনা ও জোসনা। এভাবে দেশের জেলা শহরগুলোতেও কোনো কেনো ক্ষেত্রে নারীরা ব্যবহৃত হচ্ছে মাদক ব্যবসায় আবার কখনো নারী মাদক ব্যবসায়ী হয়ে উঠছে নিয়ন্ত্রক।

মাদকসেবীদের মাদক সরবরাহ করে খুচরা ব্যবসায়ীরা। তাদের কাছে মাদক সরবরাহ করে মধ্যম মানের মাদক ব্যবসায়ীরা তাদের ওপরে আবার আরও বড়ো বড়ো সিন্ডিকেট রয়েছে। রাজনৈতিক আশ্রয় প্রশ্রয়ে মাদকের বিস্তার বাড়ছে এ কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। কক্সবাজারের একজন সাবেক সংসদ সদস্যের নামের সাথে ইয়াবা উপাধি যুক্ত করা হয়েছে। এমনকি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত তালিকায় এই সাবেক আইন প্রণেতার নাম শীর্ষে রয়েছে। খোদ রাজধানীতে বেশ কয়েকজন ওয়ার্ড কাউন্সিলরের নাম বার বার গণমাধ্যমে উঠে এসেছে। অতি সম্প্রতি মুন্সীগঞ্জের একজন ইউনিয়ন চেয়ারম্যানের আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হওয়ার রহস্য আবিষ্কার হয়েছে তার মাদকের বিশাল গোডাউন আবিষ্কার হওয়ার পর। ক্ষমতাসীন দলের থানা এবং ওয়ার্ড পর্যায়ের বেশ কয়েকজন নেতার নাম বার বার উচ্চারিত হয় মাদক ব্যবসায়ী হিসেবে। রাজনৈতিক আশ্রয় প্রশ্রয়ে মাদকের বাজার যখন বিস্তার লাভ করে তখন এর সাথে প্রশাসনের সম্পর্কটা অস্বীকার সুযোগ কমে যায়। প্রশাসন সামগ্রিকভাবে মাদক বিরোধী অভিযানে ভূমিকা পালন করছে। কিন্তু পুলিশ, র‌্যাব এবং বিজিবি সদস্যদের কেউ কেউ প্রায়ই চাকুরিচ্যুত হয় মাদক সংশ্লিষ্টতার কারণে। রাজনৈতিক নেতা, মাদক ব্যবসায়ী আর প্রশাসনের ত্রিমাত্রিক সম্পর্কের এ গাটছাড়া অবশ্যই ভেঙ্গে ফেলতে হবে।

মাদকের ভয়াবহ ছোবলে আক্রান্ত গোটা পৃথিবী। কোনো দেশ, অঞ্চল কিংবা পেশার মধ্যে এর ছোবল সীমাবদ্ধ নেই। নানান সমস্যায় নিমজ্জিত বাংলাদেশে ভয়াবহভাবে মাদকের আক্রমণে জর্জরিত। ভৌগোলিক কারণে বাংলাদেশ মাদক পাচারের অন্যতম রুট হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এক সমীক্ষায় দেখা যায় বাংলাদেশে মাদকাসক্ত বৃদ্ধিও হার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের প্রায় দ্বিগুণ। এর মধ্যে শ্রমিকদের সংখ্যা কম নয়। সরকার মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি ঘোষণা করেছে। মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর রয়েছে, পুলিশের রয়েছে পৃথক টাস্কফোর্স। প্রায়ই সারাশি অভিযান পরিচালনা করা হয় কিন্তু এর ব্যবসা এবং মাদক সেবনকারীর সংখ্যা কমছে না। মাদক মামলায় কারাগারে গিয়ে সেখানে বসে মাদক সেবন করার ঘটনাও ঘটছে।

কারারক্ষীরা পর্যন্ত মাদক সরবরাহের কারণে চাকুরিচ্যুত হয়েছে এমন নজির রয়েছে বেশ কয়েকটি। এমনকি মাদক ব্যবসায়ী হিসেবে গ্রেফতার হওয়ার পর সেখানে বসে মাদক ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করা হয় এমন সংবাদ গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। একই ব্যক্তি মাদকের মামলায় বার বার গ্রেফতার হয় আবার একই পেশায় কিংবা অভ্যাসে নিজেকে নিয়োজিত রাখছে। সীমান্ত এলাকায় যাদেরকে মাদক পরিবহন এবং ব্যবসার কাজে ব্যবহার করা হয় তাদের অধিকাংশই অত্যন্ত দরিদ্র শ্রেণির। অতি দরিদ্র শ্রেণির কৃষক এবং শ্রমজীবী মানুষগুলোকে এ কাজে ব্যবহার করা হয়। একজন শ্রমিক সারাদিন পরিশ্রম করে দিনে যেখানে ৪/৫শ টাকা আয় করতে পারে সেখানে এসব শ্রমিকদের দিনে হাজার টাকা কিংবা কোনো চালান পৌছে দিতে পারলে তাকে ৪/৫ হাজার টাকার দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে এ কাজে নিয়োগ করা হয়। সীমান্ত এলাকার শ্রমজীবী মানুষগুলো এভাবে মাদকের প্রতি ঝুঁকে পড়ে।

বাংলাদেশে কি পরিমাণ মাদক কেনা বেচা হয় তার একটি তথ্য দিয়েছে দৈনিক যুগান্তর। তাতে বলা হয়েছে, গত ১২ বছরে ইয়াবা উদ্ধার করা হয়েছে ২২ কোটি ৩০ লাখ ৭৪ হাজার ১৯১ পিস। সর্বোচ্চ উদ্ধার হয় ২০১৮ সালে ৫ কোটি ৩০ লাখ ৪৮ হাজার ৫৪৮টি এবং সর্বনিম্ন উদ্ধার হয় ২০০৯ সালে ১ লাখ ৩২ হাজার ২৮৭ পিস। হেরোইন উদ্ধার হয় ২ হাজার ৫৪৫ কেজি। সর্বোচ্চ উদ্ধার হয় ২০১৮ সালে ৪৫১.৫ কেজি ও সর্বনিম্ন ২০১৪ সালে ৭৮.৩ কেজি। কোকেন উদ্ধার হয় ৪৫.৬৯ কেজি। এর মধ্যে ২০১৩ সালে সর্বোচ্চ ১১.৬২ কেজি ও ২০১১ সালে সর্বনিম্ন শূন্য দশমিক ৪৭ কেজি। ২০০৯ সালে আফিম উদ্ধারের ঘটনা না থাকলেও ২০১৪ সালে সর্বোচ্চ ৯১.২২ কেজি উদ্ধার হয়েছে। এক যুগে মোট আফিম উদ্ধার হয়েছে ২১৭.৩৯ কেজি। গাঁজা উদ্ধার হয়েছে ৫ লাখ ৪৬ হাজার ৮৯২ কেজি। ২০১৭ সালে সর্বোচ্চ ৬৯ হাজার ৯৮৯ কেজি এবং ২০১৯ সালে সর্বনিম্ন ৩২ হাজার ৬৫৭ কেজি গাঁজা উদ্ধার হয়।

এই সময়ে ফেনসিডিল উদ্ধার হয় ১ কোটি ৯ লাখ ৪৫ হাজার ৮৮৮ বোতল। ২০০৯ সালে সর্বোচ্চ ১১ লাখ ১৭ হাজার ৩৫৪ এবং ২০১৬ সালে সর্বনিম্ন ৫ লাখ ৬৬ হাজার ৫২০ বোতল উদ্ধার হয়। এর বাইরে ২২ হাজার ৪৩০ লিটারেরও বেশ ফেনসিডিল উদ্ধার হয়। বিদেশি মদের বোতল উদ্ধার হয় ২১ লাখ ২৬ হাজার ১৯৭টি। ২০১৫ সালে সর্বোচ্চ ৩ লাখ ২২ হাজার ৫৮৯ এবং ২০১০ সালে সর্বনিম্ন ১৬ হাজার ৫২৭টি উদ্ধার হয়। এর বাইরে উদ্ধার হয় ৯ হাজার ৮৭ লিটার বিদেশি মদ। এই সময়ে ইঞ্জেকটিং ড্রাগ (অ্যাম্পুল) উদ্ধার হয় ১৪ লাখ ৩১ হাজার ১১টি। পরিসংখ্যান বিশ্লেষণে দেখা যায়, ধারাবাহিকভাবে মাদকের বিস্তার বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০০৯ সাল থেকে ইয়াবা ৪০ হাজার গুণ বেশি বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৯ সালে ৫ কোটি ৩০ লাখ ৪৮ হাজার ৫৪৮ পিস হয়েছে। ২০১৭ সাল থেকে মাদক উদ্ধারের ঘটনায় মামলা ১ লাখ ছাড়িয়েছে। এরপর আর তা লাখের নিচে নামেনি।

সমাজ বিনির্মাণে শ্রমিকদের অবদান অনস্বীকার্য। গোটা সমাজ এবং রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় শ্রমিক শ্রেণির হাতের ছোয়া ব্যতীত সমাজ এবং রাষ্ট্র অচল। অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে তারাই মূল শক্তি বিনিয়োগ করে। রাস্তা, ঘাট, কল-কারখানা, বাজার, দোকান, স্কুল, নৌ ও সমুদ্র বন্দরে বাণিজ্যিক পণ্য আনা নেওয়া করা, পরিবহন খাত থেকে শুরু সুরম্য প্রাসাদ কিংবা স্বপ্নের সেতু যাই বলুন সর্বত্র শ্রমিকের ঘামে গড়ে ওঠে মানবসভ্যতার বুনিয়াদ। শ্রমিকের ঘামে ঘূর্ণায়মান থাকে অর্থনীতির চাকা। আমাদের প্রাত্যহিক কাজে শ্রমিকের সেবা ব্যতীত প্রতিদিনের কাজগুলোও সুষ্ঠুভাবে চলতে পারে না, চলা সম্ভব নয়। শ্রমিকদের মাঝে মাদকের ভয়াবহ বিস্তার মানে গোটা সমাজ কাঠামো এভং রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় আঘাত। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি মাদকের ব্যবসার প্রধান স্থলগুলো হচ্ছে বস্তি। যেখানে শ্রমিক শ্রেণির মানুষের বসবাস। রিকশা গ্যারেজ, বাস স্টেশন, ট্রাক স্ট্যান্ড ইত্যাদি স্থানগুলো মাদকসেবী ও মাদক কারবারীদের প্রধান জায়গা।

মাদকের ভয়বাহ ছোবল হতে শ্রমিকদের বাঁচাতে প্রধান শ্লোগান হওয়া উচিত 'শ্রমিক বাঁচাও-দেশ বাঁচাও'। শ্রমিক শ্রেণির মাঝে মাদকের ভয়াবহতা প্রতিরোধে কতিপয় সুপারিশমালা :

১.মাদকের রুট হিসেবে ব্যবহৃত স্থানগুলোতে কড়া পাহারার ব্যবস্থা করা।

২.মাদক ব্যবসায়ীদের গ্রেফতারের পর দ্রুততম সময়ের মধ্যে বিচারের ব্যবস্থা করা, যাতে তারা জামিনে বের হয়ে আবার এ ব্যবসা করতে না পারে।

৩.বস্তি, মেস এবং শ্রমঘন এলাকায় আধিপত্য বিস্তারকারীদের রাজনৈতিক আশ্রয় না দেওয়ার জন্য সরকারের কঠিন এবং কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

৪.মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরকে আরও শক্তিশালী করা। শর্ষের মধ্যে যেন ভুত না থাকে এ বিষয়ে সজাগ ও সতর্ক থাকা।

৫.বস্তি, মেস এবং শ্রমঘন এলাকাগুলোকে নিয়মিত মনিটরিংয়ের আওতায় নিয়ে আসা।

৬.শ্রমিকদের জন্য আদর্শিক ও নৈতিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

৭.ধর্মীয় অনুশাসন পালনে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করে তোলা।

৮.আদর্শিক ও নৈতিক মান উন্নয়নের জন্য শ্রমিকদের মাঝে মটিভেশনাল প্রোগ্রামের ব্যবস্থা করা।

৯.মাদকের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা। এ কাজে ধর্মীয় পণ্ডিত ও আলেমদের সম্পৃক্ত করা।

১০.নিরক্ষর শ্রমিকদের জন্য বয়স্ক/গণশিক্ষার ব্যবস্থা করা।

১১.শ্রমিকদেরকে কারো লাঠিয়াল বাহিনীতে ব্যবহার না করার ব্যবস্থা করা।

১২.সকল পেশার শ্রমিকদের জন্য ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রম আরও জোরদার করা।

১৩.ট্রেড ইউনিয়নের মাধ্যমে শ্রমিকদের আইডি কার্ড দেওয়ার কাজকে আরও গতিশীল করা।

১৪.কোনো ট্রেড ইউনিয়ন সদস্য মাদকাসক্ত হলে ইউনিয়নের কর্মকর্তাদের এ বিষয়ে জবাবদিহীর ব্যবস্থা রাখা।

১৫.ট্রেড ইউনিয়নের মাধ্যমে শ্রমিকদের জন্য মানসিক বিকাশে বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা।

লেখক: সাধারণ সম্পাদক, ঢাকা মহানগরী দক্ষিণ
বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

প্রশ্নোত্তরে শ্রম আইন

বিষয়

শ্রম আইনে অসদাচরণ অপরাধ শাস্তি দণ্ড

১। প্রশ্ন: কোন শ্রমিককে বিনা নোটিশে বা নোটিশের পরিবর্তে বিনা মজুরিতে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা যাবে কি?

উত্তর: শ্রম আইনের ২৩ ধারায় অসদাচরণ এবং দণ্ডপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে শাস্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে। ১ উপধারায় বলা হয়েছে, এই আইনে লে-অফ, ছাঁটাই, ডিসচার্জ এবং চাকুরীর অবসান সম্পর্কে অন্যত্র যাহা কিছুই বলা হউক না কেন, কোন শ্রমিককে বিনা নোটিশে বা নোটিশের পরিবর্তে বিনা মজুরিতে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা যাইবে, যদি তিনি- (ক) কোন ফৌজদারী অপরাধের জন্য দণ্ডপ্রাপ্ত হন; অথবা (খ) ধারা ২৪ এর অধীন অসদাচরণের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হন।

২। প্রশ্ন: শ্রম আইনের একজন শ্রমিকের কি ধরনের শাস্তি হতে পারে?

উত্তর: শ্রম আইনের ২৩ ধারার ২ উপধারায় বলা হয়েছে, অসদাচরণের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত কোন শ্রমিককে উপ-ধারা (১) এর অধীন চাকুরী হইতে বরখাস্তের পরিবর্তে, বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, নিম্নলিখিত যে কোন শাস্তি প্রদান করা যাইবে, যথা:

(ক) অপসারণ;

(খ) নীচের পদে, গ্রেডে বা বেতন স্কেলে অনধিক এক বৎসর পর্যন্ত আনয়ন;

(গ) অনধিক এক বৎসরের জন্য পদোন্নতি বন্ধ;

(ঘ) অনধিক এক বৎসরের জন্য মজুরি বৃদ্ধি বন্ধ;

(ঙ) জরিমানা;

(চ) অনধিক সাত দিন পর্যন্ত বিনা মজুরিতে বা বিনা খোরাকীতে সাময়িক বরখাস্ত;

(ছ) ভৎসনা ও সতর্কীকরণ।

৩। প্রশ্ন: শ্রম আইনে শ্রমিককে শাস্তি দেওয়ার আগে কী কী পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়?

উত্তর: শ্রম আইনের ২৪ ধারায় শ্রমিকের শাস্তি দেওয়ার পদ্ধতি আলোচনা করা হয়েছে। নিম্নে বিষয়গুলি তুলে ধরা হলো

(ক) শ্রমিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ লিখিতভাবে করতে হবে।

(খ) অভিযোগের একটি কপি শ্রমিককে দিতে হবে এবং ইহার জবাব দেওয়ার জন্য অন্তত সাতদিন সময় দিতে হবে।

(গ) শ্রমিকের বক্তব্য শুনানির সুযোগ দিতে হবে।

(ঘ) মালিক বা শ্রমিকের সমসংখ্যক প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত তদন্ত কমিটির তদন্তের পর তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়; তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত তদন্ত ষাট দিনের মধ্যে শেষ করিতে হইবে।

৪। প্রশ্ন: কোন শ্রমিক দোষী সাব্যস্ত হলে কোন পাওনা পাবে কি?

উত্তর: এই বিষয়টি শ্রম আইনের ২৪ ধারার ৬ ও ৭ উপধারায় আলোচনা করা হয়েছে। ৬ উপধারায় আছে, যদি তদন্তে কোন শ্রমিককের দোষ পাওয়া যায় এবং তাহাকে ধারা ২৩(১) এর অধীন শাস্তি প্রদান করা হয়, তাহা হইলে তিনি তাহার সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়ের জন্য কোন মজুরি পাইবেন না, তবে উক্ত সময়ের জন্য তাহার খোরাকি ভাতা প্রাপ্য থাকিবে।

৭ উপধারায় আছে, যদি তদন্তে কোন শ্রমিকের অপরাধ প্রমাণিত না হয়, তাহা হইলে তিনি সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়ে কর্মরত ছিলেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং ঐ সময়ের জন্য তাহার, খোরাকি ভাতা সমন্বয়সহ, মজুরি প্রদেয় হইবে।

৫। প্রশ্ন: কোন শ্রমিক দোষী সাব্যস্ত হলে কি পরিমাণ জরিমানা হবে?

উত্তর: শ্রম আইনের ২৫ ধারায় শ্রমিকের জরিমানার বিধান আলোচনা করা হয়েছে।

১ উপধারায় বলা হয়েছে, কোন মজুরি মেয়াদে প্রদেয় মজুরির এক দশমাংশের অধিক পরিমাণ অর্থ কোন শ্রমিককে জরিমানা করা যাইবে না।

২ উপধারায় বলা হয়েছে, পনের বৎসরের কম বয়স্ক কোন শ্রমিকের উপর জরিমানা আরওপ করা যাইবে না।

৫ উপধারায় বলা হয়েছে, সকল জরিমানা এবং উহার আদায় বিধি দ্বারা নির্ধারিত একটি রেজিস্টারে মালিক কর্তৃক লিপিবদ্ধ করা হইবে, এবং আদায়কৃত জরিমানা কেবলমাত্র প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত শ্রমিকগণের কল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা যাইবে।

৬। প্রশ্ন: বেআইনি ও লক-আউট করলে শ্রমিকের কি দণ্ড হবে?

উত্তর: শ্রম আইনের ২৯৪ ধারায় বেআইনি ও লক-আউটের দণ্ড সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

১ উপধারায় শাস্তি সর্ম্পকে বলা হয়েছে, কোন শ্রমিক কোন বেআইনি ধর্মঘট শুরু করিলে, অথবা চালাইয়া গেলে, অথবা উহাকে আগাইয়া নেওয়ার জন্য কোন কাজ করিলে, তিনি ছয় মাস পর্যন্ত কারাদণ্ডে অথবা পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন ।

৭। প্রশ্ন: বেআইনি ও লক-আউটে প্ররোচিত করার দণ্ড হবে?

উত্তর: শ্রম আইনের ২৯৫ ধারায় বেআইনি ও লক-আউটে প্ররোচিত করার দণ্ড সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

কোন ব্যক্তি কোন বেআইনি ধর্মঘট বা লক-আউটে অংশ গ্রহণের জন্য অথবা উহার জন্য অর্থ খরচ বা সরবরাহের জন্য অথবা অন্য কোন ভাবে উহাকে আগাইয়া নেওয়ার জন্য কোন ব্যক্তিকে প্ররোচিত বা উৎসাহিত করিলে, তিনি ছয় মাস পর্যন্ত কারাদণ্ডে অথবা পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ড হইবেন ।

৮। প্রশ্ন: ঢিমে তালে কাজে অংশগ্রহণ বা প্ররোচিত করার দণ্ড কি?

উত্তর: শ্রম আইনের ২৯৬ ধারায় ঢিমে তালে কাজে অংশগ্রহণ বা প্ররোচিত করার দণ্ড কি তা বলা হয়েছে।

কোন ব্যক্তি কোন ঢিমে তালের কাজে অংশগ্রহণ করলে অথবা অন্য কোন ব্যক্তিকে উহাতে অংশগ্রহণে প্ররোচিত বা উৎসাহিত করিলে অথবা অন্য কোন ভাবে উহাকে আগাইয়া নেওয়ার জন্য কোন কাজ করিলে, তিনি ছয় মাস পর্যন্ত কারাদণ্ডে অথবা পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে, অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন ।

৯। প্রশ্ন: অ-রেজিষ্ট্রিকৃত ট্রেড ইউনিয়নের কর্মকাণ্ডের দণ্ড কি?

উত্তর: শ্রম আইনের ২৯৯ ধারায় অ-রেজিষ্ট্রিকৃত ট্রেড ইউনিয়নের কর্মকাণ্ডের দণ্ডসর্ম্পকে বলা হয়েছে।

কোন ব্যক্তি অ-রেজিষ্ট্রিকৃত অথবা রেজিষ্ট্রি বাতিল হইয়াছে এমন কোন ট্রেড ইউনিয়নের, রেজিষ্ট্রেশন প্রাপ্তি সংক্রান্ত কোন কর্মকাণ্ড ব্যতিত, অন্য কোন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করিলে অথবা অন্য কোন ব্যক্তিকে উক্তরূপ কর্মকাণ্ডে অংশ গ্রহণের জন্য উৎসাহিত বা প্ররোচিত করিলে অথবা উক্তরূপ কোন ট্রেড ইউনিয়নের তহবিলের জন্য সদস্য চাঁদা ব্যতিত অন্য কোন চাঁদা আদায় করিলে, তিনি তিন মাস পর্যন্ত কারাদণ্ডে অথবা দুই হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ড হইবেন।

১০। প্রশ্ন: ট্রেড ইউনিয়নের দ্বৈত সদস্য পদের দণ্ডকি?

উত্তর: শ্রম আইনের ৩০০ ধারায় বলা উল্লেখ আছে। কোন ব্যক্তি একই সময়ে একাধিক ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য হইলে বা থাকিলে, তিনি ১ এক মাস পর্যন্ত কারাদণ্ডে অথবা দুই হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ড হইবেন।

১১। প্রশ্ন: শ্রমিকগণের সাধারণ অপরাধের দণ্ড কি?

উত্তর: শ্রম আইনের ৩০৫ ধারায় শ্রমিকগণের সাধারণ অপরাধের দণ্ড কি হবে তা উল্লেখ আছে। এই আইনের অন্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, কোন প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত কোন শ্রমিক তাহার উপর দায়িত্ব বা কর্তব্য আরওপকারী কোন আইন বা কোন বিধি, প্রবিধান বা স্কীম বা কোন বিধি সম্মত আদেশের কোন বিধান লঙ্ঘন করিলে, তিনি পাঁচশত টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ড হইবেন।

সম্পাদনায়: এডভোকেট আলমগীর হোসাইন
কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন।

লেখা আহবান

দ্বি-মাসিক শ্রমিক বার্তার সকল পাঠক, শুভাকাঙ্খী ও শুভানুধ্যায়ীদের নিকট থেকে দ্বি-মাসিক শ্রমিক বার্তার জন্য শ্রম, শ্রমিক ও শ্রমিক আন্দোলন বিষয়ক প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ইতিহাস, সমসাময়িক বিষয়, স্মৃতিচারণমূলক লেখা এবং বিভিন্ন ট্রেড/পেশাভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ লেখা আহ্বান করা যাচ্ছে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন
৪৩৫, এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
মোবাইল: ০১৪০৩৯০৯১৮৯, ০১৮২২০৯৩০৫২
E-mail: sramikbarta2017@gmail.com

ইসলামের দৃষ্টিতে নির্মাণ শ্রমিকের ত্যাগ, মর্যাদা ও অধিকার

কাজী আবুল বাসার

দুনিয়া আখিরাতের শস্যক্ষেত্র। আল্লাহ তাআলা মানুষকে শ্রম শক্তি দিয়েই সৃষ্টি করেছেন। শ্রম যেমন হবে ফলাফলও সে অনুযায়ীই হবে। শ্রমের ফলাফল যেমনই হোক আল্লাহর কাছে বান্দার শ্রমের মর্যাদা অনেক বেশি। কারণ এ শ্রমের মাধ্যমেই আখিরাতের সফলতা লাভের ঘোষণা এসেছে। যিনি শ্রম দেন বা কাজ বাস্তবায়ন করেন তিনি হলেন শ্রমিক। শ্রমিক যদি তাঁর কাজ যথাযথভাবে আদায় করে, তবেই সে পাবে তার সুস্পষ্ট ফলাফল। মানুষের জীবনের সকল কর্ম বা শ্রমের মধ্যেই রয়েছে দুনিয়া এবং আখিরাতের কর্মফল। যে কারণে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শ্রম ও শ্রমিকের মর্যাদায় সুস্পষ্ট বর্ণনা দিয়েছেন। পৃথিবীর প্রথম মানব হজরত আদম আলাইহিস সালাম নিজে কৃষিকাজে শ্রম দিয়ে সংসারে জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা করতেন। পাশাপাশি মা হাওয়া আলাইহিস সালাম কাপড় বুনন, সেলাই এবং কৃষি যন্ত্রপাতি নির্মাণ করে হজরত আদম আলাইহিস সালামের শ্রম সহযোগিতায় অবদান রাখতেন।

হজরত নুহ আলাইহিস সালাম মহাপ্লাবনের পূর্বে আল্লাহর নির্দেশে নিজ শ্রমের মাধ্যমে এক বিশাল কিস্তি নির্মাণ করেছিলেন। তিনতলা ও বহু কক্ষবিশিষ্ট এই কিস্তি নির্মাণের শ্রম বিফলে যায়নি। এ শ্রমের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা দুনিয়ায় মানুষের অনেক কল্যাণ এবং সকল জীবের অস্তিত্ব সংরক্ষণসহ তাঁর প্রিয় বান্দাদের মহাপ্লাবন থেকে রক্ষা করেছিলেন। ইসলামে ইবাদত কবুলের পূর্বশর্ত করা হয়েছে হালাল রুটি এবং রুজিকে। মানুষের সঠিক ও কঠোর শ্রমের মাধ্যমে অর্জিত অর্থ দ্বারাই জীবিকা নির্বাহের নির্দেশনা রয়েছে। শ্রমের মধ্যে যদি ফাঁকি বা প্রতারণা থাকে তবে সে অর্থের জীবিকা ভক্ষণে ইবাদাত করলে তা হবে নিষ্ফল ইবাদাত। শ্রমকে মানুষ কষ্ট মনে করলেও প্রকৃতপক্ষে শ্রমের মাধ্যমেই মানুষ সুস্থ ও সবল দেহ লাভ করে থাকে। শ্রম মানুষের সুস্থ ও সবল থাকার কার্যকর টনিক হিসেবে কাজ করে। অলসতা ও কর্ম বিমুখতা মানুষকে অসুস্থ্য ও অন্যায় পথে পরিচালিত করে।

মুসলিম জাতির আদিপিতা হযরত ইবরাহীম (আ.) এবং তার পুত্র হযরত ঈসমাইল (আ.) আল্লাহর হুকুমে নিজ হাতে পবিত্র কাবাঘর নির্মাণ করেছেন। যেখানে আজও লক্ষ লক্ষ মুসলমান হজের উদ্দেশ্যে একত্রিত হয় সবই ঘরকে কেন্দ্র করে যার মাধ্যমে নির্মাণ শ্রমিকের মর্যাদা লক্ষ কোটিগুণ বৃদ্ধি করেছে।

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিশু জীবনে দুধমাতা হালিমার গৃহ থেকে শুরু করে ইন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত সমগ্র জীবনই কঠোর পরিশ্রম ও সাধনা করে গেছেন।

হজরত হালিমা সাদিয়ার গৃহে তিনি নীরবে নিভৃতে দুধভাই আব্দুল্লাহর সাথে ছাগল ও ভেড়া চড়াতেন। হাদিসে এসেছে, তিনি বলেছেন, “আল্লাহ দুনিয়াতে এমন কোন নবি পাঠাননি যিনি ছাগল ও ভেড়া চরাননি। তখন সাহাবিরা জিজ্ঞেস করলেন, হে রাসুল! আপনিও? তিনি বলেন, হ্যাঁ! আমিও কয়েক কীরাতের বিনিময়ে মক্কাবাসীদের ছাগল ও ভেড়া চরাতাম।” (বুখারি)

যৌবনে চাচার সংসারের সহযোগিতায় ব্যবসায় আত্মনিয়োগ করেন। এমনকি তিনি হজরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার ব্যবসায়ও শ্রম দিয়েছেন। নবুয়ত প্রাপ্তির পর ইসলামের প্রচার ও প্রসারে কঠোর শ্রম দেন। এমনকি হিজরতের পর মদিনার প্রায় মসজিদ নির্মাণে স্বশরীরে অংশ গ্রহণ করেন। ইসলামের বিজয় সুনিশ্চিত করতে সরাসরি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছেন। যুদ্ধ জয়ের কৌশল হিসেবে পরিখা খননেও অংশগ্রহণ করেন। বিশ্বনবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এর রকম অসংখ্য শ্রমের উদাহরণ রয়েছে।

শ্রম বিশ্বমানবতাকে দিয়েছে সম্মান ও মর্যাদার আসন। শ্রমের মাধ্যমেই মানুষ প্রমাণ করেছেন যে, তাঁরা সৃষ্টির সেরা জীব। তাই আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি জগতের অসংখ্য সৃষ্টিকে মানুষের অধীন করে দিয়ে বলেন, “তিনিই (আল্লাহ) তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন রাত-দিন, চন্দ্র ও সূর্যকে এবং নক্ষত্ররাজিও অধীন হয়েছে তাঁরই বিধানে। অবশ্যই এতে রয়েছে বুদ্ধিমান জাতির জন্য নিদর্শন এবং তিনি সৃষ্টি করেছেন পৃথিবীতে বিভিন্ন ধরনের বস্তু তোমাদের জন্য।” (সুরা নহল : ১২-১৩)

সমাজে নির্মাণ শ্রমিকের অবদান ও মূল্যায়ন

যে সব শ্রমিক ভবন, সড়কপথ, রেল, বিমানবন্দর, স্টেডিয়ামসহ বড়ো বড়ো স্থাপনা নির্মাণ, বিদ্যুৎ-পানি-গ্যাস-টেলিফোন লাইন স্থাপন ও মেরামত, জলাশয়, বাঁধ, জলাধার ও সুড়ঙ্গসহ যেকোন প্রকার উন্নয়ন প্রকল্পে যেকোন রকম স্থাপনা নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ এমনকি ভাঙ্গার কাজ করছেন তাঁরাই নির্মাণ কর্মী বা রাজমিস্ত্রি। একজন নির্মাণ শ্রমিকের অধীনে কয়েকজন শ্রমিক কাজ করে থাকে।

সমাজে নির্মাণ শ্রমিকের অবদান

১. সভ্যতার বিনির্মাণ : একজন নির্মাণ শ্রমিকের অবদানে সভ্যতা সৃষ্টি হয়েছে। বড়ো বড়ো শহরের বড়ো বড়ো অট্টালিকা তৈরির পিছনে সবচেয়ে বড়ো অবদান রয়েছে একজন নির্মাণ শ্রমিকের। বলা যায় সভ্যতার বিনির্মাণ শুরু হয় নির্মাণ শ্রমিকের হাত ধরে।

২. রাস্তা-ঘাট নির্মাণ : আমাদের চলাচলের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাঘাট নির্মাণ করে রাস্তাঘাট নির্মাণ করে নির্মাণ শ্রমিকরা। তারা সঠিকভাবে কাজ করে রাস্তাঘাট নির্মাণ করে বলেই আমরা অনায়াসে একস্থান থেকে অন্যস্থানে খুব দ্রুত যেতে পারি।

৩. অবকাঠামোগত উন্নয়নে ভূমিকা : একটি দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়নে নির্মাণ শ্রমিক শ্রমজীবী মানুষদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভবন নির্মাণ থেকে শুরু করে যে কোন ধরনের স্থাপনা যেমন বিমানবন্দর, সমুদ্রবন্দর, স্টেডিয়াম, ভাস্কর্য, সেতু, উড়াল সড়ক, রাস্তা, বাঁধ, কৃত্রিম জলাধার, পানি-গ্যাস-তেল সঞ্চালন লাইন, পয়োনিষ্কাশন লাইনসহ নগরায়নের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে একজন নির্মাণ শ্রমিকের কাজ।

৪. জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করা : একজন নির্মাণ শ্রমিক যখন উঁচু উঁচু ভবন নির্মাণের কাজ করেন তখন তাদের জীবনের অনেক ঝুঁকি থাকে। ১০/১৫ তলা ভবনের কাজে যখন একজন নির্মাণ শ্রমিক বিভিন্ন জিনিসপত্র ওঠানামার করেন তখন যে কোন মুহূর্তে তাদের মৃত্যু হতে পারে। মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে তারা কাজ করলেও তাদের সমস্যা দেখার কেউ নেই। এখন নির্মাণ শ্রমিকদের শ্রম আইনের আওতায় তাদের মজুরি নির্ধারণ করা হলেও ভবন নির্মাতারা সেটুকুও মানেন না। নিজেদের জীবনের মায়া না করে যারা পৃথিবীর সভ্যতা নির্মাণের কাজ করে যাচ্ছে সে সকল শ্রমিকদের সঠিক মূল্যায়ন করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য।

নির্মাণ শ্রমিকদের সঠিক মূল্যায়নে করনীয় :

১. কাজের সঠিক পারিশ্রমিক দেওয়া : নির্মাণ পেশায় কাজ করা শ্রমজীবী মানুষদের কাজের পর্যাপ্ত পারিশ্রমিক দিয়ে তাদের কাজের মূল্যায়ন করা ।

২. প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা : নির্মাণকাজ যেহেতু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় সেহেতু এই কাজ করা লোকদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করে তাদের কর্ম দক্ষতা উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা ।

৩. অতিরিক্ত কাজের সম্মানী প্রদান : নির্মাণ শ্রমজীবী মানুষদের দিয়ে অতিরিক্ত কোন কাজ করার সাথে সাথে তাদের সেই কাজের অতিরিক্ত সম্মানী প্রদান করতে হবে।

৪. ঝুঁকিভাতা প্রদান : নির্মাণ শ্রমিকরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তাদের দায়িত্ব পালন করে থাকে। তাই তাদের কাজের ঝুঁকি অনুযায়ী তাদেরকে প্রয়োজনীয় ঝুঁকি ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৫. নিরাপত্তা প্রদান : রাজ কাজে জড়িত মিস্ত্রিদের জীবনের পর্যাপ্ত নিরাপত্তা বিধানের ব্যবস্থা করতে হবে।

৬. সামাজিক অধিকারের নিশ্চয়তা: নির্মাণ কাজে জড়িত সকল নির্মাণ শ্রমিককে কোনোভাবেই সামাজিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। সকল সামাজিক সুযোগ-সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে তাদের কাজের মূল্যায়ন করতে হবে।

৭. পর্যাপ্ত নিরাপত্তা সরঞ্জাম প্রদান : একজন নির্মাণ শ্রমিকের জীবনের নিরাপত্তার স্বার্থে তাদের পর্যাপ্ত নিরাপত্তা সামগ্রী প্রদান করে তাদের কাজকে আরও সহজ ও গতিশীল করা।

৮. অতিরিক্ত চাপ থেকে বিরত রাখা : একজন নির্মাণ শ্রমিক যেহেতু অনেক বেশি কায়িক পরিশ্রম করেন তাদেরকে অবশ্যই অতিরিক্ত চাপ না দেওয়া উচিত। তাদের কাজকে সহজ করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। রাসুল (সা) শ্রমজীবী মানুষদের ওপর এমন কোন কাজের বোঝা চাপিয়ে দিতে নিষেধ করেছেন যা তার জন্য অসহনীয় হয়। (বুখারী)

৯. কর্মস্থলে নিহত শ্রমিকের পরিবারের ভরন পোষনের ব্যবস্থা: কোন নির্মাণ শ্রমিক কাজ করতে গিয়ে যদি মারা যায় তাহলে তার পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া। বাংলাদেশে নয় শুধু পৃথিবীর অনেক দেশেই পরিবহনের পরপরই নির্মাণ খাতে সবচেয়ে বেশি মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে বলে বিভিন্ন সংগঠনের পরিসংখ্যানে বলা হচ্ছে। শ্রমিক অধিকার নিয়ে কাজ করছে এমন একটি সংগঠন বলছে, নির্মাণ খাতে গত বছর ১৩৪ জন শ্রমিক নিহত হয়েছে। তারপরও বিষয়গুলো অবহেলিতই থেকে যায়। কখনও অবস্থা চরমে পৌঁছালে তখন দু-একটা ঘটনা প্রকাশ হলে ব্যবস্থা নেওয়ার প্রশ্ন আসে। তবে ইদানীং ট্রেড ইউনিয়ন হওয়ার কারণে নির্মাণ শ্রমিকরা তাদের দাবি আদায়ে সোচ্চার হয়েছে। শ্রমিকদের দাবি নিয়ে বিভিন্ন সমাবেশ করা হয়েছে। এসব সমাবেশে নির্মাণ শ্রমিকদের মৌলিক অধিকার বাস্তবায়নের দাবি জানিয়েছেন শ্রমিক নেতারা। তাদের দাবি-দুর্ঘটনার শিকার শ্রমিকদের একজীবনের সমপরিমান ক্ষতিপূরণ শ্রমআইনের আওতায় আনতে হবে। প্রতি মাসে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের বোর্ড সভা করতে হবে এবং শ্রমিকদের পেনশন স্কিম, রেশনিং ব্যবস্থা, বাসস্থান ও কর্মস্থলে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। বর্তমানে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনও নির্মাণ শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে বেশ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

পরিশেষে বলবো

ইসলামের রীতি-নীতি ও বিধানের আলোকে দেশের সর্বোচ্চ মহল সরকার থেকে শুরু করে সমাজের প্রত্যেক দায়িত্বশীলের উচিত শ্রমের মর্যাদা এবং শ্রমিকের ন্যায্য অধিকার আদায় করা। কারণ সমাজের সবচেয়ে দামি ও উপকারী শ্রেণি হচ্ছে শ্রমিক সমাজ। মানব সমাজের উন্নতি ও অগ্রগতির চাকা ঘুরছে শ্রমিকদের হাতে। একটি টেকসই ও উন্নত সমাজ বিনির্মাণে সবাই শ্রমিকদের পরিশ্রমের কাছে ঋণী। আল্লাহ তাআলা সমাজের সর্বস্তরের দায়িত্বশীলদেরকে শ্রম ও শ্রমিকের মূল্যায়ন প্রতিষ্ঠা এবং তাদের অধিকার রক্ষা করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

লেখক: কেন্দ্রীয় কর্মসংস্থান বিষয়ক সম্পাদক
বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

ফেডারেশন সংবাদ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের জেলা ও মহানগরী সভাপতি-সাধারণ সম্পাদক সম্মেলন-২০২২ অনুষ্ঠিত

শ্রম আন্দোলনকে ট্রেড ভিত্তিক আন্দোলনে পরিণত করতে হবে : ডা. শফিকুর রহমান

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের প্রধান উপদেষ্টা ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, শ্রমিক সমস্যা সমাধানের জন্য ট্রেড ভিত্তিক আন্দোলনকে গুরুত্ব দিতে হবে। শ্রম আন্দোলনকে ট্রেড ভিত্তিক আন্দোলনে পরিণত করা গেলে শ্রমিকদের সমস্যা সমাধানে আরও কার্যকর ভূমিকা রাখা যাবে। তাই ইসলামী শ্রমনীতির আন্দোলনকে অবশ্যই ট্রেড ভিত্তিক আন্দোলনে পরিণত করতে হবে।

তিনি গত ১৬ আগস্ট মঙ্গলবার বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের উদ্যোগে ভার্চুয়ালি আয়োজিত জেলা ও মহানগরী সভাপতি-সাধারণ সম্পাদক সম্মেলন-২০২২ এ প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আতিকুর রহমান-এর সঞ্চালনায় এই সময় মূলমঞ্চে আরও উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি গোলাম রব্বানী, লস্কর মুহাম্মদ তসলিম, সহ-সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আলমগীর হোসাইন, কোষাধ্যক্ষ আজহারুল ইসলাম, দপ্তর সম্পাদক নুরুল আমিন প্রমুখ।

ডা. শফিকুর রহমান বলেন, শ্রমিক আন্দোলনে ট্রেড ইউনিয়ন নিয়ামক শক্তি। শ্রম আইনের আলোকে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করতে হবে। মজবুত ট্রেড ইউনিয়নের জন্য সাধারণ শ্রমিকদের সম্পৃক্ত করতে হবে। কিছু কিছু ট্রেড আছে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এই সকল ট্রেডে সংগঠন গড়ে তুলতে হবে। ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃত্বকে অবশ্যই মানসম্পন্ন হতে হবে। যাদের কাঙ্ক্ষিত মান নেই সে সকল ভাইদের কাঙ্ক্ষিত মানে নিয়ে আসার জন্য নিবিড় প্রচেষ্টা চালাতে হবে। মানসম্পন্ন লোক ছাড়া ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার আদর্শিক লক্ষ্য পূরণ হবে না।

তিনি আরও বলেন, শ্রমজীবী মানুষ সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও তাদের সাথে মানুষ ভালোভাবে মিশে না। শ্রমজীবী মানুষের সাথে প্রাণখুলে মিশতে হবে। শ্রমজীবী মানুষের প্রত্যাশা খুব সীমিত। তাদের প্রত্যাশা আকাশ ছোঁয়া না। এই সকল মানুষ চায় সমাজের অন্য মানুষরা তাদের ভালোবাসুক ও সম্মান-শ্রদ্ধা করুক। শ্রমিক নেতৃবৃন্দকে অবশ্যই এটি নিশ্চিত করতে হবে। এই জন্য সকল ধরনের জড়তা দূরে ঠেলে শ্রমজীবী মানুষের সাথে মিশতে হবে। মনে রাখতে হবে আল্লাহর রাসুল (সা) খাব্বাব, খোবাইয়েব ও বেলাল (রা) দের নিয়ে আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন।

ডা. শফিক বলেন, শ্রমিক কল্যাণ শুধুমাত্র শ্রমিকদের স্বার্থে কাজ করে না। বরং এই সংগঠন মালিক-শ্রমিক উভয়ের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে। এর মাধ্যমে এই সংগঠন দেশের ইতিবাচক পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। বাংলাদেশে শ্রমিক সংকটের পেছনে রয়েছে এক শ্রেণির মালিকদের শ্রমিকের ওপর জুলুম-নির্যাতন করার মানসিকতা। রাষ্ট্র শক্তি মাঝে মাঝে এসব মালিকদের সহায়তা করে সংকট আরও গভীর করে তুলে। এই সমস্যার সমাধান করতে হলে ইসলামী শ্রমনীতিতে ফিরে যেতে হবে। ইসলামী শ্রমনীতি মালিক ও শ্রমিকদের ওপর দুটি প্রধান দায়িত্ব ন্যাস্ত করেছে। প্রথমটি হলো একে অপরের ওপর কর্তব্য। দ্বিতীয়টি হলো অধিকার। কর্তব্য ঠিকমতো আদায় হলে অধিকার নিয়ে কথা বলা যায়। মালিক-শ্রমিক যদি এই দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হয় তাহলে শ্রমিক সংকট আর থাকবে না।

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের অধিবেশন-২০২২ অনুষ্ঠিত

দুঃশাসন ও অব্যাহত দুর্নীতি লুটপাটের কারণে দেশ আজ মহাসংকটে: অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান বলেছেন, বাংলাদেশ তার ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ সংকটকাল অতিক্রম করছে। ক্ষমতাসীন সরকারের দুঃশাসন ও অব্যাহত দুর্নীতি লুটপাটের কারণে এই মহাসংকট সৃষ্টি হয়েছে। রাষ্ট্রে সৎ মানুষের শাসন কায়েম ছাড়া এই সংকট দূর হবে না।

তিনি গত ১০ আগস্ট বুধবার রাজধানীর একটি মিলনায়তনে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের উদ্যোগে কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সাধারণ অধিবেশনে সভাপতির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আতিকুর রহমানের সঞ্চালনায় এতে আরও উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি গোলাম রব্বানী, লস্কর মুহাম্মদ তসলিম, কবির আহমদ, মুজিবুর রহমান ভূইয়া, মনসুর রহমান প্রমুখ।

অধ্যাপক হারুনুর রশিদ বলেন, সরকার সারাদেশে বাজারগুলোতে সিন্ডিকেট তৈরি করে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষদের জিম্মি করেছে। আজ মানুষ হাটে-বাজারে যেতে পারছে না। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের চরম উর্ধ্বগতি চলছে। চাল-ডাল-তেলের দাম নিম্ম আয়ের মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাহিরে চলে গেছে। এর মধ্যে জ্বালানি তেল ও ইউরিয়া সারের দাম বৃদ্ধি করে মানুষদের আরও বিপাকে ফেলেছে। প্রতিদিন কোন না কোন জিনিসপত্রের দাম বেড়েই চলছে। কিন্তু সরকার বাজার নিয়ন্ত্রণ না করে অযৌক্তিক ও বেহুদা কথাবার্তা বলে সিন্ডিকেট ও কালোবাজারীদের আশকারা দিচ্ছে। সরকারের আশকারা পেয়ে তারা অবৈধ সম্পদ ও কালো টাকার পাহাড় গড়ে তুলেছে।

তিনি আরও বলেন, বর্তমান সরকার শ্রমিকবান্ধব সরকার নয়। যদি তারা শ্রমিকবান্ধব সরকার হতো তাহলে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে শ্রমিকের বেতন-ভাতা বৃদ্ধি করতো। কিন্তু সরকারের এই উদ্যোগ গ্রহণ করার মতো মানসিকতা নেই। তারা চায় তাদের দলীয় নেতাকর্মীদের কালো টাকা ও সম্পদে ভরপুর করে তুলতে। যেন তারা আগামী নির্বাচনে এই টাকা ব্যবহার করে পুনরায় ক্ষমতায় আসতে পারে। কিন্তু তারা জানে না দেশের জনগণ তাদের প্রতি এতটাই অসন্তুষ্ট যে সুষ্ঠু ভোট হলে ক্ষমতাসীন দলের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাবে।

অধ্যাপক হারুনুর রশিদ বলেন, চলমান অযৌক্তিক মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে দেশের মানুষ যখন ফুলে ফেঁপে উঠেছে তখন সরকার তাদের পুরানো রূপে ফিরে গেছে। তারা অস্ত্রের মুখে মানুষের প্রতিবাদের ভাষা স্তব্দ করে দিতে চায়। তাই সারা দেশে বিরোধী দলের নেতাকর্মীদের খুন-গুম, গ্রেফতার আবার শুরু করেছে। আমরা কারাগারে আটক বিরোধী দলের নেতাকর্মী ও শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলামসহ সকল রাজবন্দিদের আশু মুক্তি দিতে সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছি।

আজকের এই সম্মেলনে নিম্মোক্ত প্রস্তাবনা গৃহীত হয়েছে

১. আজকের এই কার্যকরী পরিষদের অধিবেশন গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছে যে, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতিতে খেটে খাওয়া শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বাহিরে চলে গেছে। আজ শ্রমজীবী মানুষ অনাহারে অর্ধাহারে মানবেতর জীবন-যাপন করছে। আজকের এই অধিবেশন মানুষের দুর্বিষহ পরিস্থিতি থেকে আশু মুক্তির জন্য সকল সিন্ডিকেট ভেঙ্গে সকল দ্রব্যমূল্যের দাম সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে নিয়ে আসতে জোর দাবি জানাচ্ছে।

২. এই অধিবেশন গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ করছে যে, সরকার ইউরিয়া সারের দাম কেজি প্রতি ৬ টাকা বৃদ্ধি করে কৃষকদের বিপাকে ফেলে দিয়েছে। এই দাম বৃদ্ধির ফলে দেশে খাদ্য উৎপাদন হুমকির মুখে পড়বে। এই থেকে উত্তরণের জন্য অযৌক্তিক মূল্য বৃদ্ধি প্রত্যাহারের জন্য আজকের অধিবেশন দাবি জানাচ্ছে। অন্যদিকে দেশের শ্রমশক্তির ৬৫ ভাগ কৃষি খাতে নিয়োজিত। কিন্তু দেশে এখনোও কৃষি ভিত্তিক শিল্প কারখানা গড়ে না উঠার কারণে কৃষক পণ্যের নায্য মূল্য পাচ্ছে না। ফলে কৃষক কাজের আগ্রহ হারাচ্ছে এবং তাদের আর্থিক অবস্থার কোন পরিবর্তন হচ্ছে না। এই অধিবেশন সরকারি ও বেসরকারি ভাবে কৃষি ভিত্তিক শিল্প কারখানা গড়ে তোলার জন্য জোর দাবি জানাচ্ছে।

৩. আজকের অধিবেশন আরও গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছে, সরকারের অহেতুক ভাবে জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি দেশকে মহাসংকটের দিকে ফেলে দিচ্ছে। জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধির কারণে কৃষক হতে শুরু করে সমাজের নিম্ম আয়ের মানুষের জীবন আবারও ধাক্কা খেয়েছে। জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধির কারণে যানবাহনের ভাড়া ও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। এক্ষেত্রে সরকারের ইশারায় একশ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ীরা মানুষদের জিম্মি করে জ্বালানি তেল চারগুণ দামে বিক্রি করছে। আজকের এই অধিবেশন জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি প্রত্যাহার করে জ্বালানি তেলের মূল্য কমিয়ে জন-জীবনে স্বস্তি ফিরিয়ে আনার দাবি জানাচ্ছে। আজকের এই অধিবেশন জ্বালানি তেলের ক্ষেত্রে সরকারের পক্ষ থেকে ভুর্তকি বৃদ্ধি করার দাবি জানাচ্ছে।

৪. এই অধিবেশন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি আ ন ম শামসুল ইসলাম (সাবেক এমপি) ও সাবেক সভাপতি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার (সাবেক এমপি) সহ সকল রাজবন্দিদের নিঃশর্ত মুক্তি দাবি করছে এবং রাজনৈতিকভাবে দায়েরকৃত সকল মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করে দেশে সুশাসন ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবি জানাচ্ছে।

৫. শ্রমিক বাঁচলেই শিল্প বাঁচবে, শিল্প বাঁচলে দেশ বাঁচবে এবং দেশের অর্থনীতি সুদৃঢ় হবে। টেকসই উৎপাদন খাতকে মজবুত করতে হলে শ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। তাই এই অধিবেশন শ্রমিকদের জীবন যাত্রার মান ঠিক রাখার লক্ষ্যে রেশনিং ব্যবস্থা চালু করার জন্য সরকারের প্রতি জোর দাবি জানাচ্ছে।

৬. আজকের এই অধিবেশন মনে করে গার্মেন্টস শ্রমিকদের সর্বনিম্ম মজুরী ৮০০০/- টাকা নির্ধারণ করা হলেও অধিকাংশ গার্মেন্টস মালিক শ্রমিকদের সর্বনিম্ম মজুরি না দিয়ে বিভিন্নভাবে শ্রমিকদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে। এমনকি দাবি আদায়ের আন্দোলনকে দমনের নামে হয়রানি ও গ্রেফতার করে অন্যায়ভাবে শ্রমিকদের চাকুরিচ্যুত করছে। এই অধিবেশন গার্মেন্টস শিল্পে বর্তমানে গৃহীত কালাকানুন টার্মিনেশন এ্যাক্ট বাতিল করে পূর্বের আইন বহাল করার জোর দাবি জানাচ্ছে এবং সর্বনিম্ম মজুরি ২০০০০/- টাকা ও বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট নির্ধারণ করে মজুরি কমিশন ঘোষণা করার দাবি জানাচ্ছে। সকল বন্ধ গার্মেন্টস খুলে দিয়ে শ্রমিকদের চাকুরিতে বহাল রাখার জোর দাবি জানাচ্ছে।

৭. আজকের এই অধিবেশন বন্ধকৃত ২৬টি জুট মিলের শ্রমিক-কর্মচারিদের যাবতীয় বকেয়া পাওনাদি অবিলম্বে পরিশোধ করার জোর দাবি জানাচ্ছে এবং বিএমআরই পদ্ধতিতে আধুনিকায়ন করে উক্ত ২৬ট জুট মিলসহ সরকারি ও বেসরকারি বন্ধকৃত সকল কল-কারখানা অবিলম্বে চালু করার জোর দাবি জানাচ্ছে।

৮. এই অধিবেশন আইএলও কনভেনশন মোতাবেক অবাধ ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার ও ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদের নিয়োগপত্র প্রদান নিশ্চিত করার জোর দাবি জানাচ্ছে। ট্রেড ইউনিয়ন করার ক্ষেত্রে সরকার ও শ্রম অধিদপ্তরকে জটিলতা সৃষ্টি না করে সহজ শর্তে ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন দেওয়ার জোর দাবি জানাচ্ছে।

৯. এই অধিবেশন গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ করছে যে, পরিবহন সেক্টরে নৈরাজ্য, চাঁদাবাজি বন্ধ করতে না পারলে পরিবহন শ্রমিকদের দুর্দশা শেষ হবে না। তাই অধিবেশন পরিবহন শ্রমিকদের নিয়োগপত্র প্রদান, চাঁদাবাজি ও হয়রানি বন্ধ করার জোর দাবি জানাচ্ছে এবং শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন থেকে দুর্ঘটনা কবলিত পরিবহন শ্রমিকদের জন্য কমপক্ষে ১ লক্ষ টাকা বরাদ্ধ দেওয়ার জোর দাবি জানাচ্ছে।

১০. আজকের এই অধিবেশন মনে করে যে, বাংলাদেশ রেলওয়ে একটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন অগ্রগতি মানে দেশের উন্নতি। তাই বাংলাদেশ রেলওয়েকে দ্রুত আধুনিকায়নের পাশাপাশি ঢাকা-লাকশাম-ঢাকা কর্ড লাইন, দোহাজারী-কক্সবাজার ও বগুড়া, জামতইলসহ সারাদেশে রেলওয়ে সম্প্রসারণ করার জোর দাবি জানাচ্ছে।

১১. আজকের এই অধিবেশন মনে করে যে, শ্রমজীবী মানুষের প্রকৃত

সমস্যার সমাধান কুরআন সুন্নাহর আইন প্রতিষ্ঠা ছাড়া সম্ভব নয়। তাই ইসলামী শ্রমনীতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শ্রমজীবী মানুষসহ সকল স্তরের শ্রমিক জনতাকে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের পতাকাতলে শামিল হওয়ার উদাত্ত আহবান জানাচ্ছে।

শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির বৈঠকে ইউরিয়া সার ও জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ

কৃষক-মজুরের জীবন সরকার দুর্বিষহ করে তুলেছে : অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান বলেছেন, সরকার নিজেদের দুর্নীতি-লুটপাট আড়াল করতে গিয়ে কৃষক-মজুরের জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছে। উন্নয়নের নামে একের পর এক মেগা প্রকল্প হাতে নিয়ে হাজার হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচার করেছে।

তিনি গত ০৮ আগস্ট ২০২২, সোমবার রাজধানীর একটি মিলনায়তনে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির বৈঠকে সভাপতির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আতিকুর রহমান-এর সঞ্চালনায় এতে অংশ নেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি গোলাম রব্বানী, লস্কর মুহাম্মদ তসলিম, কবির আহমাদ, মুজিবুর রহমান ভূইয়া, মনসুর রহমান, ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আলমগীর হোসাইন, আব্দুস সালাম, মোহাম্মদ মহিব্বুল্লাহ, কোষাধ্যক্ষ আজহারুল ইসলাম ও দপ্তর সম্পাদক নুরুল আমিন প্রমুখ।

হারুনুর রশিদ বলেন, দেশে গত এক বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের সীমাহীন ঊর্ধ্বমুখী চলছে। কৃষক-মজুর ও খেটে খাওয়া মেহনতি মানুষরা আজ দিশাহীন। ঠিক এই সময় সরকার ইউরিয়া সারের মূল্য বৃদ্ধি করে কৃষকদের বিপাকে ফেলে দিয়েছে। এমনিতে দেশে কৃষকরা উৎপন্ন পণ্যের ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত। এমতাবস্থায় কৃষি পণ্যের দাম বৃদ্ধির কারণে কৃষকরা চাষ করার আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে। ফলে দেশে ভয়াবহ খাদ্য সংকট দেখা দিবে। খাদ্য আমদানি করতে গিয়ে সরকার আবারও দ্রব্যমূল্যের দাম বৃদ্ধি করবে। তিনি আরও বলেন, বর্তমান সরকার জনবান্ধব সরকার নয়। রাতের আঁধারে জ্বালানি তেলের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির ঘোষণা দিয়ে সরকার এই কথা আবারও প্রমাণ করেছে। বিশ্ববাজারে যখন জ্বালানি তেলের মূল্য হ্রাস পাচ্ছে তখন সরকার কোন রকম জনশুনানী ছাড়া একতরফা ভাবে জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধির ঘোষণা দিয়েছে। জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধির নেতিবাচক প্রভাব কৃষি হতে শুরু করে সর্বত্র ইতোমধ্যে পড়তে শুরু করেছে। ডিজেল ও ইউরিয়া সারের মূল্য বৃদ্ধিতে কৃষকের খরচ বৃদ্ধি পাবে। অন্যদিকে জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধিতে যানবাহনের ভাড়া বৃদ্ধির হেতু জিনিসপত্রের দাম আরেকদফা বৃদ্ধি পাবে। এর প্রভাবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত ও কষ্টের শিকার হবে কৃষক-মজুর ও খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষরা।

অধ্যাপক হারুন বলেন, সরকার বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে লুটপাট ও দুর্নীতি আড়াল করতে চাইছে। কিন্তু দেশের মানুষের কাছে এটি দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট মেগা প্রকল্পের নামে সরকারের লোকজন বিদেশে হাজার হাজার কোটি টাকা পাচার করায় আজ আমাদেরকে আইএমএফ কাছে হাত পাততে হচ্ছে। আইএমএফ তাদের অযৌক্তিক শর্ত আমাদের উপর চাপিয়ে দিচ্ছে। আর সরকার আরও দুর্নীতি ও লুটপাটের আশায় সে শর্ত মেনে নিচ্ছে। সরকারকে অবিলম্বে বিদেশে পাচারকৃত টাকা ফিরিয়ে আনতে হবে এবং সকল দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি রোধ করতে ও অযৌক্তিকভাবে প্রদত্ত সকল পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি বাতিল করতে সরকারের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কুমিল্লা অঞ্চলের উদ্যোগে ষান্মাসিক সদস্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত

শ্রমজীবী মানুষের মানবিক মর্যাদা নিশ্চিত করতে হবে : এ টি এম মা'ছুম

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা মাওলানা এ টি মা'ছুম বলেছেন, শ্রমজীবী মানুষদের মানবরচিত ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করে একদল মানুষ ও রাজনৈতিক দল নিজেদের ফায়দা হাসিল করে নিচ্ছে। অন্যদিকে পদে পদে শ্রমিকরা হচ্ছে নিপীড়িত-নির্যাতিত। আজ শ্রমিকদের সমাজ রাষ্ট্রে ন্যূনতম মর্যাদা নেই। তারা আজ সর্বহারা। শ্রমজীবী মানুষের মুক্তির জন্য প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে মানুষ হিসেবে তাদের মানবিক মর্যাদা নিশ্চিত করা।

তিনি গত ৪ জুলাই সোমবার বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কুমিল্লা অঞ্চলের উদ্যোগে ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত ষান্মাসিক সদস্য সম্মেলনে প্রধান অতিথি বক্তব্যে এসব কথা বলেন। ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ও কুমিল্লা অঞ্চলের পরিচালক এডভোকেট আতিকুর রহমান-এর সভাপতিত্বে এবং ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও অঞ্চল সহকারী পরিচালক ড. সরওয়ার উদ্দিন সিদ্দিকী-এর সঞ্চালনায় এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা আব্দুর রব, ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান, কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা অধ্যাপক লিয়াকত আলী ভূইয়া। সম্মেলনে আরও

বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের নোয়াখালী জেলা সভাপতি এডভোকেট জহিরুল আলম, কুমিল্লা মহানগরী সভাপতি কাজী নজির আহমদ, চাঁদপুর জেলা সভাপতি রহুল আমিন, লক্ষ্মীপুর জেলা সভাপতি মমিন উল্লাহ পাটোয়ারী, ফেনী জেলা ভারপ্রাপ্ত সভাপতি কেফায়েত উল্লাহ ভূইয়া, কুমিল্লা দক্ষিণ জেলা সভাপতি খাইরুল ইসলাম, কুমিল্লা জেলা উত্তরের সভাপতি গিয়াস উদ্দিন ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা সভাপতি আমিনুল ইসলাম প্রমুখ।

মাওলানা এ টি এম মা'ছুম বলেন, শ্রমজীবী মানুষের অঙ্গন ব্যাপক ও বিস্তৃত। শ্রমজীবী মানুষদের সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদী ধারায় পরিচালিত করে এক দল মানুষ শ্রমিকদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদী মতবাদে বিশ্বাসী ব্যক্তিরা মনে করে শ্রমিকরা হচ্ছে যন্ত্র এবং তাদের স্বার্থে শ্রমিকদের যেমন ইচ্ছা তেমনভাবে খাটানো যাবে। এই ধারণায় বিশ্বাসী তথাকথিত আধুনিক ও প্রাশচাত্য সভ্যতার মানুষরা প্রতিনিয়ত শ্রমিকদের ওপর জুলুম ও নিপীড়ন চালিয়ে যাচ্ছে। তারা মানুষে মানুষে বিভাজন তৈরি করেছে। মানুষের মধ্যে শ্রেণিতাত্ত্বিক দেওয়াল তুলে দিয়েছে। ধারাবাহিকভাবে চলা এই নীতিতে শ্রমিকরাও মনে করছে তাদের জন্ম হয়েছে শুধু মালিকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য। তাদের এই জীবনে দু'বেলা দুমুঠো খেয়ে কোন ভাবে বাঁচতে পারলেই হলো। আর কোন চাহিদা তাদের নেই বা থাকতে পারে না।

এ টি এম মা'ছুম বলেন, মানুষকে আল্লাহ আশরাফুল মাখলুকাত করে সৃষ্টি করেছেন। মানুষের মধ্যে কোন বিভাজন বা শ্রেণিভাগ করেননি। আল্লাহর কাছে মানুষের মর্যাদা নির্ধারিত হবে কর্মের ভিত্তিতে। সকল মানুষের জন্য আল্লাহর বিধান একই। আজকের দুনিয়ার সকল অশান্তির মূলে রয়েছে মানবরচিত মতবাদের সীমাবদ্ধতা। পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত হচ্ছে আল্লাহর বিধান পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠা করা। পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ খেটে খাওয়া শ্রমিক। এই শ্রমিকদের জীবনে শান্তি ফিরিয়ে আনতে হলে সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদ নামক মাকাল ফল ফেলে দিয়ে কুরআনের পথে ফিরে আসতে হবে। আমাদের দেশের শ্রমিকরা স্বল্প শিক্ষিত। তারা সত্য সুন্দরের পথের আলো থেকে বঞ্চিত। তাদের কাছে কুরআনের দাওয়াত ও সত্য সুন্দরের পথ তুলে ধরতে হবে। তাদেরকে দেখাতে হবে ইসলাম তাদের জন্য কী সুন্দর অনুপম নীতি প্রণয়ন করেছে। ইসলামী শ্রমনীতি যদি শ্রমিকদের সামনে পেশ করা যায় তাহলে আশা করা যায় দেশের একজন শ্রমিকও আর ভ্রান্তনীতির পক্ষে নিজেদেরকে ধাবিত করবে না। তারা সকলেই ইসলামী শ্রমনীতির পতাকাতলে নিজেদেরকে শামিল করবে।

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন নোয়াখালী জেলার উদ্যোগে ষান্মাসিক কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত

শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য শ্রম আন্দোলনকে জোরদার করতে হবে : ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ তাহের

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ তাহের বলেছেন, সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার পূর্বশত হচ্ছে শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। দেশের দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ শ্রমিক। অথচ সেই সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমিকরা সবচেয়ে বেশি অবহেলিত ও শোষিত। রাষ্ট্র ও সরকারের দুর্বল নেতৃত্ব মালিকদেরকে শ্রমিকদের ওপর শোষণের সুযোগ করে দিয়েছে। এই শোষণের অবসানের জন্য শ্রম আন্দোলনকে জোরদার করতে হবে।

তিনি গত ১৭ জুলাই বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন নোয়াখালী জেলার উদ্যোগে ষান্মাসিক কর্মী সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। ফেডারেশনের জেলা সভাপতি এডভোকেট জহিরুল আলম-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মিজানুল হক মামুন-এর সঞ্চালনায় এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান, কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আতিকুর রহমান, নোয়াখালী জেলার প্রধান উপদেষ্টা ইসহাক খন্দকার, উপদেষ্টা নিজামউদ্দিন ফারুক। সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের জেলা সহ-সভাপতি মেজবাহ উদ্দিন ভূঁইয়া, কোম্পানিগঞ্জ উপজেলা সভাপতি এবিএম হেলাল উদ্দিন, সেনবাগ উপজেলা সভাপতি নুরুল হুদা মিলন, নোবিপ্রবি সভাপতি ইউসুফ আলি, শহর সভাপতি অলিউল্লাহ ইয়াছিন, সদর উপজেলা সভাপতি জাহাঙ্গীর উদ্দীন আহম্মেদ চৌধুরী, সুবর্ণচর উপজেলার ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মোবারক হোসেন, চাটখিল উপজেলা সভাপতি ইউসুফ আসলাম, সোনাইমুড়ি উপজেলা সভাপতি আবদুল খালেক শামিম, হাতিয়া উপজেলা সভাপতি ওসমান গনি রুবেল প্রমুখ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ডা. তাহের বলেন, স্বাধীনতার ৫০ বছর অতিক্রম করলে দেশের মানুষ স্বাধীনতার প্রকৃত সুখ পায়নি। এক শ্রেণির সুবিধাভোগী লোকেরা স্বাধীনতার মূল্যবোধ ছিনতাই করে দেশকে চরম অব্যবস্থাপনার দিকে ঠেলে দিয়েছে। মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সিংহভাগ ছিল শ্রমিক জনতা। যাদের স্বপ্ন ছিল নিপীড়ন ও শোষণমুক্ত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার। কিন্তু তাদের সেই আকাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন আজও অধরাই থেকে গেছে। মূলত একশ্রেণির উচ্চাবিলাসী ও পথভ্রষ্ট রাজনীতিবীদের হাত ধরে দেশ ধ্বংসের দিকে ধাবিত হয়েছে। এক্ষেত্রে তারা দেশের মানুষকে দুনিয়ার যতসব বস্তা পঁচা রাজনৈতিক তত্ত্ব দিয়ে বিভ্রান্ত করেছে। মেহনতি শ্রমিকরা একটু সুখ ও কল্যাণের আশায় তাদের ফাঁদে পা দিয়ে নিজেদের সকল অধিকার বিসর্জন দিয়েছে।

তিনি আরও বলেন, মেহনতি শ্রমিকদের পীঠ আজ দেওয়ালে ঠেকে গেছে। এই নির্যাতন নিপীড়ন ও দুঃশাসন আর মুখে সহ্য করার ক্ষমতা আজ তাদের নেই। সকল জুলুম নিপীড়ন প্রতিঘাত করতে হবে। এই জন্য সর্বপ্রথম শ্রমিকদের মধ্যে আদর্শিক আন্দোলনের ভিত্তি মজবুত করতে হবে। সারাদেশের সকল মেহনতি শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ করে আগামী দিনে সকল দুঃশাসনের জবাব দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে।

ফেনীতে সেপটিক ট্যাংক বিস্ফোরণে নিহত ৩ জন শ্রমিক পরিবারের সাথে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতির সাক্ষাৎ ও আর্থিক সহায়তা প্রদান

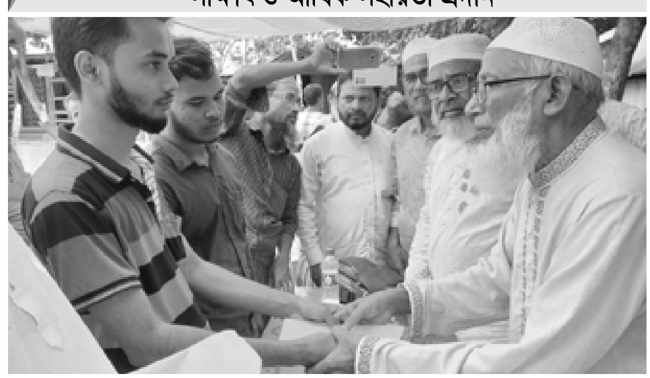

অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে দুর্ঘটনার শিকার শ্রমিকদের পরিবারের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব রাষ্ট্রকে নিতে হবে: অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি

অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান বলেছেন, দেশের অধিকাংশ শ্রমিক অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত। এই সকল শ্রমিকরা সকল অধিকার ও নাগরিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকরা অহরহ দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছে। দুর্ঘটনার শিকার শ্রমিকদের সাহায্যার্থে কেউ এগিয়ে আসে না। এই সকল শ্রমিকদের পরিবারের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব রাষ্ট্রকে নিতে হবে।

তিনি গত ০১ আগস্ট ২০২২, সোমবার বাগেরহাটে ফেনীতে কর্মরত অবস্থায় সেপটিক ট্যাংক বিস্ফোরণে নিহত তিন ভাই আবদুর রহমান মুন্সি, নুরুল ইসলাম মুন্সি ও মনিরুজ্জামান মুন্সি-এর পরিবারের সদস্যদের সাথে সাক্ষাৎকালে এসব কথা বলেন। এসময় তিনি নিহতদের পরিবারের সদস্যদের সান্ত্বনা দেন ও ফেডারেশনের পক্ষ থেকে আর্থিক সাহায্য তাদের হাতে তুলে দেন। এই সময় আরও উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মাস্টার শফিকুল আলম, সহ-সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আলমগীর হোসাইন, বাগেরহাট জেলার উপদেষ্টা এডভোকেট ইউনুস, ফেডারেশনের জেলা সভাপতি মঞ্জুরুল ইসলাম রাহাত।

অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান বলেন, দুর্ঘটনার শিকার শ্রমিকদের চিকিৎসা হতে শুরু করে যাবতীয় দায়িত্ব গ্রহণ করার কথা ছিল রাষ্ট্রের। কিন্তু আমাদের দেশে কল্যাণকামী সরকার না থাকার কারণে শ্রমিকরা তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত। ইসলাম বলে মালিক শ্রমিক ভাই ভাই। রাষ্ট্র উভয়ের মাঝে সমন্বয় সাধন করবে। উভয়ের কল্যাণ ও উন্নতি করতে রাষ্ট্র সচেষ্ট থাকার কথা। কিন্তু দেশে ইসলামী সরকার ও শ্রমনীতি না থাকার কারণে শ্রমিকদের দুর্দশার অবসান হচ্ছে না।

অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান নিহত শ্রমিকদের কবর জিয়ারত করেন। মরহুমদের নেক আমল সমূহ কবুল করে তাদেরকে জান্নাতুল ফেরেদৌস দান করার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে বিশেষভাবে দোয়া করেন। একই সাথে আত্মীয়স্বজনকে ধৈর্য ধরার শক্তি দান করার জন্য দোয়া করেন।

উল্লেখ্য ফেনী শহরের নাজির রোডে আনোয়ার উল্লাহ সড়কে একটি নির্মাণাধীন বাড়িতে কর্মরত থাকা অবস্থায় গত ২৬ জুলাই (মঙ্গলবার) সেপটিক ট্যাংক বিস্ফোরণে তিন ভাই নিহত হোন। তাদের গ্রামের বাড়ি বাগেরহাট জেলার মোড়লগঞ্জ উপজেলায়। তারা সবাই পেশায় নির্মাণ শ্রমিক ছিলেন।

বিবৃতি

ঈদুল আজহার ছুটির পূর্বে শ্রমিকদের বেতন-ভাতা পরিশোধ করুন : শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান ও সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আতিকুর রহমান গত ৫ জুলাই মঙ্গলবার এক যৌথ বিবৃতিতে পবিত্র ঈদুল আজহার ছুটির পূর্বে প্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শ্রমিকদের বেতন ও উৎসব ভাতা পরিশোধের জন্য মালিকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। একই সাথে নেতৃবৃন্দ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শ্রমিকদের জন্য রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে বিশেষ ঈদ ভাতা প্রদানের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

নেতৃবৃন্দ বলেন, দেশের অধিকাংশ মানুষ শ্রমজীবী। তারা খুব সামান্য বেতনে দৈনন্দিন জীবন-যাপন করে। বর্তমান বাজারের তুলনায় শ্রমিকের শ্রমমূল্য অতি নগণ্য। ফলে শ্রমজীবী মানুষদের সঞ্চয় বলে কিছু থাকে না। ঈদের সময় সন্তান ও পরিবার-পরিজনের জন্য একটু নতুন পোশাক ও ভালো খাবার তুলে দেওয়ার জন্য শ্রমিকদেরকে উৎসব ভাতার ওপর নির্ভর করতে হয়। শ্রমিকরা যে উৎসব ভাতার দিকে সারা বছর চেয়ে থাকে সেই উৎসব ভাতা নিয়ে মালিকরা প্রতি বছর টালবাহানা করে। এটি দেশের জন্য যেমন লজ্জার ঠিক তেমনি ভাবে প্রতিটি শ্রমিকের জন্য কষ্টদায়ক। আমরা চাই এই টালবাহানার অবসান হোক। ঈদের পূর্বে সকল শ্রমিকদের প্রাপ্য বেতন ও বেতনের সম পরিমাণ উৎসব ভাতা বুঝিয়ে দেওয়া হোক। আমরা কোনভাবে শ্রমিক অসন্তোষ সৃষ্টি হোক এটি প্রত্যাশা করি না। এক্ষেত্রে সরকারের উর্ধ্বতন দায়িত্বশীল ও বিশেষ করে শ্রম মন্ত্রণালয়কে বিশেষ ভূমিকা নেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।

নেতৃবৃন্দ বলেন, দেশের একটি বৃহৎ অংশ শ্রমিকরা অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত রয়েছে। এই সকল শ্রমিকরা উৎসব ভাতা বঞ্চিত। রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক চাকা সচল রাখতে প্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শ্রমিকদের পাশাপাশি অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শ্রমিকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শ্রমিকদের তালিকা প্রণয়নপূর্বক তাদের জন্য রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে উৎসব ভাতা প্রদান করতে হবে। ভুলে গেলে চলবে না দেশের প্রতিটি শ্রমিকের মুখে হাসি ফোটানো রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব। সেই দায়িত্বের জায়গা থেকে সরকারকে বিশেষ ভূমিকা পালন করতে হবে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, সিলেট ও উত্তরবঙ্গসহ দেশের একটি বৃহৎ অংশে এখনো ভয়াবহ বন্যা চলছে। বন্যার কারণে অসংখ্য শ্রমিক কর্মহীন অবস্থায় আছে। এই সকল শ্রমিকদের জন্য রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে বিশেষ বরাদ্ধ দিতে হবে। বন্যা দুর্গত মানুষের জন্য ত্রাণ কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। যতদিন না কর্মহীন শ্রমিক তার কর্মক্ষেত্রে ফিরতে পারছে ততদিন পর্যন্ত তাদের দৈনন্দিন খাবার, ওষুধ ও যাবতীয় খরচের ব্যয়ভার সরকারকে বহন করতে হবে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, আমাদের প্রত্যাশা ঈদের উৎসব থেকে বঞ্চিত হবে না একটি শ্রমিক পরিবারও। এই জন্য যে উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন তার আলোকে সরকার, মালিক ও শ্রমিকরা মিলে যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করতে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।

দেশে ও প্রবাসে অবস্থানরত সর্বস্তরের শ্রমিক-মজুরসহ দেশবাসীকে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের পক্ষ থেকে ঈদুল আজহার শুভেচ্ছা

আত্মত্যাগের মহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে ঈদুল আজহা পালন করুন : শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান ও সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আতিকুর রহমান গত ৮ জুলাই শুক্রবার এক যৌথ বিবৃতিতে, দেশে ও প্রবাসে অবস্থানরত সর্বস্তরের শ্রমিক-মজুরসহ দেশবাসীকে আসন্ন পবিত্র ঈদুল আজহার শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। নেতৃবৃন্দ বলেন, ঈদুল আজহা আত্মত্যাগ, তিতিক্ষা ও আবেগের সম্মিলিত উৎসব। ঈদুল আজহা কেবল গোশত ও কোরবানির নাম নয়, বরং এটি আল্লাহর রাহে নিজের সর্বস্ব বিলিয়ে দেওয়ার এক দৃপ্ত শপথের নাম। ঈদুল আজহা আমাদেরকে সকল প্রকার হিংসা-বিদ্বেষ, লোভ-লালসা ও পাপ-পঙ্কিলতা থেকে ফিরে এসে মনের পশুত্বকে কোরবানি দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করে। এই কোরবানির অপর নাম হচ্ছে আত্মত্যাগ। আমাদের সকলকে আত্মত্যাগের মহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে আসন্ন ঈদুল আজহা পালন করতে হবে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, ঈদুল আজহার দিন পশু কোরবানির মাধ্যমে আল্লাহর সাথে বান্দাহর এক অনুপম সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। বান্দাহ কোরবানির মাধ্যমে জানিয়ে দেয় তার সকল কাজের একমাত্র উদ্দেশ্য তার রবের সন্তুষ্টি আদায়। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনও বান্দাহর আত্মত্যাগে খুশি হয়ে তার জন্য রেখে দেন বিশেষ পুরস্কার। অন্যদিকে ঈদুল আজহা সমাজে বসবাসরত মানুষের মধ্যে বিশেষ সেতুবন্ধন তৈরি করে। কোরবানি মানুষের হৃদয়ে আত্মত্যাগের শিক্ষাকে প্রোথিত করে মানবিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করে। ফলে সমাজ হতে সকল ধরনের হিংসা-বিদ্বেষ ও ভেদাভেদ দূরীভূত হয়। ধনী ও গরিব বৈষম্য ভুলে গিয়ে একটি মানবিক ও আদর্শিক সমাজ প্রতিষ্ঠার অনুপ্রেরণা দেয় ঈদুল আজহা।

নেতৃবৃন্দ বলেন, দেশের উত্তরাঞ্চল ও বৃহত্তর সিলেটে আকস্মিক বন্যার কারণে লাখ লাখ মানুষ পানিবন্দি হয়ে দুঃসহ জীবন অতিবাহিত করছে। বিশেষত শ্রমজীবী মানুষরা সবচেয়ে বেশি দুর্দশার শিকার। আজ তাদের ঘরে খাবার নেই। জরুরি চিকিৎসা সামগ্রী ও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নেই। পরিবার-পরিজন নিয়ে চরম দুঃসময় কাটছে তাদের। এই দুর্দশাগ্রস্থ মানুষের পাশে দাঁড়ানো প্রত্যেক সামর্থ্যবান ব্যক্তির নৈতিক ও মানবিক দায়িত্ব। এই ঈদের সময় আসুন আমরা প্রত্যেকে স্ব স্ব জায়গায় থেকে বানভাসি মানুষের পাশে থেকে তাদের ঈদকে আনন্দময় করে তুলি। অসহায় ও বন্যার্ত মানুষের সেবায় নিজেদের সামিল করে ঈদুল আজহাকে আরও সার্থক করে তুলি।

পরিশেষে নেতৃবৃন্দ শ্রমজীবী মানুষসহ দেশবাসীর কল্যাণ, সুখ-শান্তি ও উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নিকট দোয়া করেন। বিশেষভাবে বন্যা দুর্গত মানুষের দুর্যোগ থেকে মুক্তির জন্য আল্লাহর সাহায্য চান। ঈদুল আজহা যেন আমাদের জাতীয় জীবনে অনাবিল প্রশান্তির বার্তা নিয়ে আসে আল্লাহর কাছে সে নিবেদন করেন।

জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধির তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ

জ্বালানি তেলসহ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য মূল্যের বর্ধিত দাম প্রত্যাহার করতে হবে : শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান ও সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আতিকুর রহমান গত ০৬ আগস্ট ২০২২, মঙ্গলবার এক যৌথ বিবৃতি বলেছেন, সরকারের অব্যাহত লুটপাট, দুর্নীতি ও দুঃশাসনের কারণে বাংলাদেশ আজ এক চরম দুঃসময় চলছে। সরকার তার ব্যর্থতার দায় জনগণের উপর চাপিয়ে দিচ্ছে। একের পর এক নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য মূল্যের দাম বৃদ্ধি করে শ্রমজীবীসহ দেশের মানুষর জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে। দেশের মানুষের জন-জীবনে স্বস্তি ফিরিয়ে আনার জন্য অবিলম্বে জ্বালানি তেলসহ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য মূল্যের বর্ধিত দাম প্রত্যাহার করতে হবে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, সরকার নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে নানা কূটকৌশলের আশ্রয় নিচ্ছে। এক মুখে বলছে দেশে কোন সংকট নেই। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক ঋণদাতাদের নিকট ঋণ পেতে ধরনা দিচ্ছে। ঋণদাতাদের নানা অযৌক্তিক শর্ত পূরণ করতে গিয়ে ইতোমধ্যে ইউরিয়া সারের বস্তা প্রতি তিনশ টাকা বৃদ্ধি করেছে। তারই ধারাবাহিকতায় গতকাল জ্বালানি তেলের দাম এক লাফে ৩৪-৪৬ টাকা বাড়িয়ে দিয়েছে। দেশের মানুষ স্পষ্টত্ব মনে করে সরকার দলীয় লোকজনকে আরও দুর্নীতি ও লুটপাট করার সুযোগ দিতে ঋণদাতাদের নিকট সরকার ধরণা দিচ্ছে। এই ঋণের টাকা পূর্বের মত বিদেশে পাচার হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, সরকার সব কিছুর দাম বৃদ্ধি করে জনগণকে ঠুনকো অজুহাত দিচ্ছে। দেশের জনগণ তাদের এসব অজুহাত আর বিশ্বাস করে না। যখন বিশ্ব বাজারে তেলের দাম কমে ছিল তখন সরকার তেলের দাম কমানোর প্রয়োজনবোধ করেনি। কিন্তু এই সময়ে যখন বিশ্ব বাজারে তেলের দাম স্থিতিশীল তখন সরকার তেলের দাম বাড়িয়ে শুধু জন দুর্ভোগ সৃষ্টি করেছে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, অযৌক্তিক সকল বর্ধিত মূল্য অবিলম্বে প্রত্যাহার করে শ্রমজীবীসহ সাধারণ মানুষের জীবনে স্বস্তি ফিরিয়ে আনতে হবে। সরকারের সকল দুর্নীতি ও লুটপাট বন্ধ করে অতীতের সকল অপকর্মের সুষ্ঠু তদন্ত করতে হবে। অন্যথায় দেশের মানুষ এই সরকারের সকল জুলুম ও অপশাসনের বিরুদ্ধে অচিরে রাজপথে নেমে আসবে।

চা-শ্রমিকদের আন্দোলনে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের নৈতিক সমর্থন

চা-শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি অবিলম্বে মেনে নিতে হবে: শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান ও সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আতিকুর রহমান গত ১৭ আগস্ট ২০২২, বুধবার এক যৌথ বিবৃতিতে সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জসহ দেশের বিভিন্নস্থানে আন্দোলনরত চা-শ্রমিকদের আন্দোলনে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের পক্ষ থেকে নৈতিক সমর্থন জানিয়েছেন। একই সাথে নেতৃবৃন্দ বলেন, আমাদের দেশের চা শ্রমিকরা যুগের পর যুগ ধরে শোষণ ও বঞ্চনার শিকার হয়ে আসছে। দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়ায় আজ তারা আন্দোলনে নেমেছে। আমরা মনে করি তাদের প্রতিটি দাবি যৌক্তিক এবং অবিলম্বে তাদের দাবি মেনে নেওয়ার জন্য মালিকদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।

নেতৃবৃন্দ বলেন, চা শিল্প শ্রমিকদের কঠোর পরিশ্রমের কারণে বাংলাদেশ আজ বিশ্বের শীর্ষ দশটি দেশের একটি দেশে পরিণত হয়েছে। চা মালিকরা প্রচুর অর্থ-সম্পদের মালিক বনে গেছে। কিন্তু চা-শ্রমিকদের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন হয়নি। আজকের যুগেও চা-শ্রমিকদের দাসের জীবন অতিবাহিত করতে হচ্ছে। বর্তমান বাজারে কোনভাবেই একজন শ্রমিকের দৈনিক মজুরি ১২০ টাকা হতে পারে না। এটি অমানবিক ও শোষণের চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ।

নেতৃবৃন্দ বলেন, দেশে আজ চাল-ডাল-তেল হতে শুরু করে সকল নিত্যপণ্যের দাম আজ আকাশ ছোঁয়া। সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষরা আজ অনাহারে-অর্ধাহারে জীবন অতিবাহিত করছে। অথচ শ্রমিকের শ্রমে যারা অর্থবিত্তের মালিক হয়েছে তারা বিলাসী জীবন-যাপন করছে। একটি দেশে এই দুইনীতি কোনভাবে চলতে পারে না। আমরা চাই শ্রমিকের শ্রমে উৎপন্ন পণ্যে শ্রমিকের মুনাফা নিশ্চিত করতে হবে। দেশে সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন নিশ্চিত করতে হবে। অন্যথায় শ্রমিকরা আজীবন শোষিত থেকে যাবে।

চা-শ্রমিকদের মজুরি ১২০ থেকে বাড়িয়ে ৩০০ টাকা করা দাবি মেনে নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে নেতৃবৃন্দ বলেন, বর্তমান বাজারের চাহিদা অনুযায়ী একজন শ্রমিকের ন্যূনতম বেতন হওয়া উচিত ৫০০ টাকা। তারপরও চা শ্রমিকরা তাদের বেতন সময়ের বাস্তবতায় অনেক কম চেয়েছে। আমরা মনে করি চা শিল্পের সংকট নিরসনে শ্রমিকদের দাবি মেনে নেওয়ার মধ্যে কল্যাণ রয়েছে। তাই আর বিলম্ব না করে মালিকদের উচিত এই দাবি মেনে নেওয়া।

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের উদ্যোগে সারাদেশে ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত

ট্রেড ইউনিয়নের মাধ্যমে শ্রমিকের সমস্যা সমাধান করতে হবে : এডভোকেট আতিকুর রহমান

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আতিকুর রহমান বলেছেন, দেশের শ্রমজীবী মানুষরা নানা ধরনের সমস্যায় জর্জরিত। শ্রমিকের সমস্যা তুলে ধরার জন্য কেউ কথা বলে না। শ্রমিকের সমস্যা সমাধান করতে হলে ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দকে সোচ্চার হতে হবে। মিছিল-মিটিংসহ ট্রেড ইউনিয়নের যাবতীয় কার্যক্রমের মাধ্যমে শ্রমিকের সমস্যা সমাধান করতে হবে।

তিনি গত ১৫ জুলাই বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন হবিগঞ্জ জেলার অন্তর্ভুক্ত মাধবপুর উপজেলা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন (মৌল-২১) ও মাধবপুর উপজেলা রিকশা, ভ্যান ও ঠেলাগাড়ি শ্রমিক ইউনিয়ন (মৌল-৩৭)-এর উদ্যোগে ঈদ পুনর্মিলনীতে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের জেলা সভাপতি কাজী আব্দুর রউফ বাহার-এর সভাপতিত্বে ও মাধবপুর উপজেলা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান রেজা-এর সঞ্চালনায় এতে আরও উপস্থিত ছিলেন মাধবপুর উপজেলা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি মোঃ নায়েবুল্লাহ, মাধবপুর উপজেলা রিকশা, ভ্যান ও ঠেলাগাড়ি শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি মোঃ ইকবাল হোসেন, সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হাসানসহ ট্রেড ইউনিয়নের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ।

আতিকুর রহমান বলেন, দেশের মোট জন সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ শ্রমিক। শ্রমিকরা নানামুখী পেশায় নিয়োজিত। শ্রম আইনে বিভিন্ন পেশার শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন করার সুযোগ রাখা হলেও ট্রেড ইউনিয়নের নিবন্ধন করতে শ্রমিকদের নানামুখী প্রতিবন্ধকতার মুখামুখী হতে হয়। নির্মাণ শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন করার সুযোগ দিলেও শ্রম আইনে তাদের সুযোগ-সুবিধা বা অধিকার নিয়ে কিছু বলা নেই। ফলে নির্মাণ শ্রমিকরা অনেক সমস্যায় জর্জরিত থাকলেও কাগজে কলমে এসব সমস্যা সমাধানের জন্য কোন নীতি নেই। যে সব পেশায় ট্রেড ইউনিয়ন করার সুযোগ শ্রম আইন করে দিয়েছে সেখানেও রয়েছে নানামুখী বাধা-বিপত্তি। মালিকরা চায় না তাদের কল-কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা হোক। যারা ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ গ্রহণ করে তাদেরকে বিভিন্ন অজুহাতে মালিকরা চাকরিচ্যুত করে। ফলে পেটের দায়ে শ্রমিকরা ট্রেড ইউনিয়ন করতে চায় না। ট্রেড ইউনিয়ন না থাকার সুবাদে মালিকরা নিজেদের খেয়াল খুশিমত শ্রমিকদের বেতন-ভাতা প্রদান করে। শ্রমিকরা তাদের ন্যায্য বেতন-ভাতা ও অন্যান্য সুবিধার দাবিতে কথা বলতে পারে না। তারা মুখ বুঝে সব সহ্য করে যায়।

তিনি আরও বলেন, ট্রেড ইউনিয়ন হলো শ্রমিকের অধিকার আদায়ের মঞ্চ। ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দকে এই মঞ্চ ব্যবহার করে শ্রমিকের সমস্যা সমাধান যেমন করতে হবে ঠিক অনুরূপভাবে শ্রমিকের ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রাম অব্যাহত রাখতে হবে। ভুলে গেলে চলবে না এই সমাজে কেউ কারও অধিকার এমনি এমনি দিয়ে দেয় না। প্রয়োজনের তাগিদে রাজপথে তীব্র লড়াইয়ের মাধ্যমে মালিকপক্ষের অন্যায্য ও অন্যায় আবদার ভেঙ্গে দিয়ে শ্রমিকের কাঙ্ক্ষিত অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। একই সাথে সুষ্ঠু ও আদর্শিক শ্রমনীতি প্রতিষ্ঠার জন্য ট্রেড ইউনিয়নগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে।

প্রচলিত শ্রম আইনে শ্রমিক সমস্যার সমাধান হবে না : এডভোকেট আতিকুর রহমান

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আতিকুর রহমান বলেছেন, যে দেশে প্রতি বছর ঈদের সময় বেতন ও উৎসব ভাতার দাবিতে শ্রমিকদের রাজপথে নেমে আসতে হয়। ন্যায্য পাওনা চাইতে গিয়ে শিল্প পুলিশের লাঠির মার খেতে হয়। কথায় কথায় চলে শ্রমিক ছাঁটাই। যে দেশের শ্রম আইন শ্রমিকদের সুরক্ষা দেওয়ার পরিবর্তে মালিকদের বেশি নিরাপত্তা দেয়। সে দেশের প্রচলিত শ্রম আইনে শ্রমিক সমস্যার সমাধান হবে না।

তিনি গত ১৩ জুলাই বুধবার গোয়াইনঘাট উপজেলা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন (সিলেট-৫৭) এর উদ্যোগে ঈদ পুর্নমিলনী ও আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। ইউনিয়ন সভাপতি সাইফুল ইসলাম-এর সভাপতিত্বে ও নাজিম উদ্দীন মোহাম্মদ কাওসার-এর সঞ্চালনায় এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন জৈন্তাপুর উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান জয়নাল আরেবদীন, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক মাওলানা সোহেল আহমদ, সিলেট জেলা উত্তরের সভাপতি নিজাম উদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক ও জালালাবাদ ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান জালাল উদ্দিন, ফতেহপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মিনহাজ উদ্দিন, ফেডারেশনের গোয়াইনঘাট উপজেলার প্রধান উপদেষ্টা মাস্টার আবুল হোসেন, স্থলবন্দরের বিভাগীয় সাধারণ সম্পাদক আব্দুল খালিক, জৈন্তাপুর উপজেলা সভাপতি গিয়াস উদ্দিন প্রমুখ।

আতিকুর রহমান বলেন, একজন শ্রমিক হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করা সত্ত্বেও ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত। তাদের নামমাত্র মজুরি দেওয়া হয়। সামান্য বেতন দিয়ে বাসা ভাড়া ও খাবার খরচ মিটাতে তাদের হিমশিম খেতে হয়। টাকার অভাবে শ্রমিকের সন্তানরা শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। শ্রমিকের সন্তানরা বছরে দুই ঈদের সময় বাবা-মায়ের দিকে তাকিয়ে থাকে একটি নতুন পোশাকের জন্য। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্ত্বেও প্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের খাতা কলমে হিসেব করে যে সামান্য উৎসব ভাতা ঘোষণা করা হয় সেই ন্যূনতম ভাতাটুকু দিতে

মালিকপক্ষ চরম অনিহা প্রকাশ করে। অন্যদিকে দুই তৃতীয়াংশ শ্রমিক অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত। তাদের জন্য কোন ধরনের উৎসব ভাতা বরাদ্দ থাকে না। ফলে এসব পরিবারে ঈদের আনন্দ আসে না।

তিনি আরও বলেন, ইসলাম শ্রমিকদের জন্য একটি সার্বজনিন আদর্শিক শ্রমনীতি উপহার দিয়েছে। আল্লাহর রাসুল (সা) বলেছেন, তুমি নিজের জন্য যা পছন্দ করো, তোমার অধীনস্ত শ্রমিকের জন্য তাই পছন্দ করো। তুমি যা খাও, শ্রমিককে তাই খেতে দাও। কিন্তু বাংলাদেশ শুধু সারা বিশ্বে এই অনুকরণীয় শ্রমনীতি দেখা যায় না। তাই আমরা শ্রমিক ভাইদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই, আসুন কাঙ্ক্ষিত মুক্তির জন্য ইসলামী শ্রমনীতির পক্ষে নিজেদের সম্পৃক্ত করি। প্রচলিত শ্রমনীতির বদলে ইসলামী শ্রমনীতি প্রতিষ্ঠার জন্য এই আন্দোলনকে আরও বেশি গতি নিয়ে শ্রমিকদের মাঝে ছড়িয়ে দিতে কার্যকর ভূমিকা পালন করি।

রায়পুর উপজেলার উদ্যোগে ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন রায়পুর উপজেলার উদ্যোগে স্থানীয় এক মিলনায়তনে ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা সভাপতি মাষ্টার মহিউদ্দিন হারুনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মাস্টার আব্দুল মালেকের পরিচালনায় উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আতিকুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা সভাপতি মমিন উল্লাহ পাটোওয়ারী। এসময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা উপদেষ্টা আব্দুল আউয়াল রাসেল, জেলা সহ- সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আবুল বাশার, উপজেলা সহ-সভাপতি আব্দুল জলিল মিয়া, রায়পুর উপজেলা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি মাস্টার ইসমাইল প্রমুখ।

অন্যদিকে লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার উত্তর হামছাদী ইউনিয়নের উদ্যোগে ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইউনিয়ন সভাপতি রফিকুল ইসলাম-এর সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আতিকুর রহমান। বিশেষ অতিথি ফেডারেশনের জেলা সভাপতি মমিন উল্লাহ পাটোওয়ারী, সদর উপজেলা সভাপতি ডা. শাসসুল হুদা প্রমুখ।

বগুড়া শহর শাখার উদ্যোগে ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন বগুড়া শহর শাখার কর্ণপুর সাংগঠনিক থানার উদ্যোগে ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়। কর্ণপুর সাংগঠনিক থানার সভাপতি মোখলেসুর রহমানের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক সেকেন্দার আলীর পরিচালনায় ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও রংপুর অঞ্চলের পরিচালক গোলাম রব্বানী। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুল মতিন, বগুড়া শহর সভাপতি আজগর আলী, সাধারণ সম্পাদক আনোয়ারুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল কুদ্দুস। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সহ-সভাপতি আব্দুল আজিজ, সমিল শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল বারী, অটোমোবাইল পেইন্টারস ইউনিয়নের সভাপতি আজহার আলী রাজা, শ্রমিক নেতা স্বাধীন ইনসান আলী, ইয়াসিন আলী প্রমুখ।

সিলেট মহানগরীর উদ্যোগে ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন সিলেট মহানগরীর উদ্যোগে ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের সিলেট মহানগরী সভাপতি এডভোকেট জামিল আহমদ রাজুর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মিয়া মোহাম্মদ রাসেলের পরিচালনায় ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আতিকুর রহমান। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও সিলেট অঞ্চলের পরিচালক মাওলানা সোহেল আহমদ। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন মহানগরীর সহ-সাধারণ সম্পাদক কফিল উদ্দিন আলমগীর, সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা মোঃ আব্দুল্লাহ, প্রকাশনা সম্পাদক মোঃ নজরুল ইসলাম মারুফসহ বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়নের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকবৃন্দ।

গাজীপুর মহানগরীর উদ্যোগে ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন গাজীপুর মহানগরীর উদ্যোগে দায়িত্বশীলদের নিয়ে ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়। মহানগরী সভাপতি মোঃ মুহি-উদ্দিনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদ মাহবুবুল হাসানের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত ঈদ পুনর্মিলনীতে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও ঢাকা বিভাগ উত্তর অঞ্চলের পরিচালক মনসুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের উপদেষ্টা মোঃ খায়রুল হাসান। এসময় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মহানগরীর সহ-সভাপতি মনসুর আহমদ, অধ্যাপক ডাঃ আজিজুর রহমান, সহ-সাধারণ সম্পাদক নূরে আলম ভূঁইয়া, কোষাধ্যক্ষ বীর মুক্তিযোদ্ধা নুরুজ্জামান ফকির, দফতর সম্পাদক আব্দুল মতিন, প্রচার ও প্রকাশনার সম্পাদক গোলাম মাওলা সেলিম, সমাজসেবা সম্পাদক রুহুল আমিন, মহানগর দোকান ও ব্যাংক কর্মচারী সভাপতি শ্রমিক নেতা আশরাফ হোসেন রাজু। উক্ত অনুষ্ঠানে মহানগরের সকল কার্যনির্বাহী সদস্যবৃন্দ, থানা সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক এবং ট্রেডইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

মাদারীপুর জেলার রাজৈইর পৌরসভার উদ্যোগে ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন মাদারীপুর জেলার রাজৈইর পৌরসভার উদ্যোগে ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। পৌরসভা সভাপতি শেখ মোশারফ হোসেন-এর সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের জেলার প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা আব্দুস সোবহান খান। বিশেষ অতিথি ফেডারেশনের জেলা সভাপতি খন্দকার দেলোয়ার হোসাইন।

মঠবাড়িয়া উপজেলার উদ্যোগে ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যান ফেডারেশন পিরোজপুর জেলার মঠবাড়িয়া উপজেলার উদ্যোগে ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উপজেলা সভাপতি শ্রমিক নেতা তারিক মুনাওয়ারের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মুতালিব মৃধার পরিচালনায় ঈদ পুনর্মিলনীতে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের জেলা সভাপতি অধ্যক্ষ মোহাম্মদ জহিরুল হক। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের উপজেলা প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক শরীফ আব্দুল জলিল।

উখিয়া উপজেলার উদ্যোগে ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যান ফেডারেশন কক্সবাজার জেলার উখিয়া উপজেলার উদ্যোগে ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপজেলা সভাপতি সরোয়ারুল ইসলামের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আমান উল্লাহ সঞ্চালনায় ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন কক্সবাজার জেলা সভাপতি শামসুল আলম বাহাদুর। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা সাংগঠনিক সম্পাদক এম ইউ বাহাদুর, কোষাধ্যক্ষ জসিম উদ্দিন। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কোষাধ্যক্ষ মাওলানা হাফিজ উদ্দিন, শ্রমিকনেতা আজিজ উদ্দিন, হাফেজ রিদুয়ানুল করিম, নুরুল ইসলাম, আরাফাত হোছাইন, আবছার উদ্দিন, মিজানুর রহমান প্রমুখ।

ছাতক পৌরসভার ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক পৌরসভার ঠেলাগাড়ি শ্রমিক ইউনিটের উদ্যোগে ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়। ঠেলাগাড়ি শ্রমিক ইউনিটের সভাপতি মোঃ এরশাদ মিয়ার সভাপতিত্বে ও কোষাধ্যক্ষ তোফায়েল আহমেদের পরিচালনায় ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের জেলা সভাপতি মোঃ শাহ আলম। বিশেষ অতিথি পৌরসভা শাখার প্রধান উপদেষ্টা ইঞ্জিনিয়ার নোমান আহমদ, উপদেষ্টা হযরত মাওলানা মোঃ মুজিবুর রহমান, আবু সিদ্দিক, ফেডারেশনের পৌর সভাপতি মোঃ ওয়াসিদ আলী, সহ-সভাপতি মোঃ ছানিক আহমদ, সাধারণ সম্পাদক ক্বারি জালাল উদ্দীন, ছাতক উপজেলা নির্মান শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মোঃ ছানিক মিয়া, ৭ নং ওয়ার্ডের সভাপতি মোঃ জালাল উদ্দীন, ৩ নং ওয়ার্ডের সভাপতি সাধারণ সম্পাদক আলী আহমদ, শ্রমিক নেতা সহিদ মিয়া চৌধুরী, সামছু মিয়া সাইফুল্লাহ আহমদ মিসর।

ঠাকুরগাঁও জগন্নাথপুর ইউনিয়নের উদ্যোগে ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঠাকুরগাঁও জেলার সদর পূর্ব থানার ১৭নং জগন্নাথপুর ইউনিয়নের উদ্যোগে ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়।
ফেডারেশনের জগন্নাথপুর ইউনিয়নের সভাপতি মোঃ খলিলুর রহমানের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মোঃ ফিরোজুল হকের পরিচালনায় ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের সাবেক জেলা সভাপতি মাওলানা মোঃ ফজলে রাব্বী মর্তুজাবী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঠাকুরগাঁও শহর শাখার সাধারণ সম্পাদক মোঃ আব্দুল হালিম, সদর পূর্ব শাখার সভাপতি মোঃ আল মামুন ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক হাফেজ মাওলানা মোঃ মিজানুর রহমান প্রমুখ।

সেবামূলক কার্যক্রম

সুনামগঞ্জ বন্যা দুর্গত মানুষের মাঝে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ

বন্যা দুর্গত শ্রমজীবী মানুষের দুর্ভোগ লাঘবে এগিয়ে আসুন : শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি কবির আহমাদ বলেছেন, সিলেটে এখন ইতিহাসের ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয় চলছে। এই বিপর্যয়ে সবচেয়ে বেশি ক্ষতির সম্মুখীন এই অঞ্চলের শ্রমজীবী মানুষরা। আকস্মিক বন্যায় নিম্ন আয়ের শ্রমিকরা কর্ম হারিয়ে মানবেতর জীবন-যাপন করছে। শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন বন্যার শুরু থেকে সাধ্যের সবটুকু নিয়ে শ্রমজীবী মানুষসহ বন্যা দুর্গত পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। শ্রমজীবী মানুষের এই দুর্দিনে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। বন্যা দুর্গত শ্রমজীবী মানুষের দুর্ভোগ লাঘবে এগিয়ে আসার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

তিনি ২৮ জুন সুনামগঞ্জ জেলার উদ্যোগে সুনামগঞ্জ পৌরসভা, শান্তিগঞ্জ উপজেলা ও সদর উপজেলার লক্ষণ শ্রী ইউনিয়নসহ জেলার বিভিন্ন স্থানে বন্যা দুর্গত মানুষের মাঝে ত্রাণ বিতরণ কালে এসব কথা বলেন। এই সময় আরও উপস্থিত ছিলেন শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক মাওলানা সোহেল আহমাদ, সিলেট মহানগর সভাপতি এডভোকেট জামিল আহমাদ রাজু, সুনামগঞ্জ জেলা সভাপতি শাহ আলম, পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের জেলা সভাপতি মুসাদ্দিক হোসেন, শ্রমিক নেতা মতিউর রহমান, সিরাজুল ইসলাম ওলি, মতিউর রহমান নিজামী প্রমুখ।

লালমনিরহাট জেলার উদ্যোগে বন্যা দুর্গত মানুষের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ

গত ২৩ জুন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন লালমনিরহাট জেলার উদ্যোগে কালিগঞ্জ উপজেলার শতাধিক বানভাসি মানুষের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করা হয়। লালমনিরহাট জেলা সভাপতি রেনায়েল আলমের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি গোলাম রাব্বানী। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুল মতিন, রংপুর অঞ্চলের টিম সদস্য এডভোকেট ইয়াসিন আলী, রংপুর মহানগর সভাপতি এডভোকেট কাওসার আলী, আদিতমারী উপজেলা সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট ফিরোজ হায়দার লাভলু, কালীগঞ্জ উপজেলার উপদেষ্টা মাওলানা রুহুল আমিন। ফেডারেশনের কালীগঞ্জ উপজেলা সভাপতি মাওলানা মোজাম্মেল হক বাবুল ও সাধারণ সম্পাদক প্রভাষক লুৎফর রহমান প্রমুখ।

গাইবান্ধা জেলার উদ্যোগে বন্যা দুর্গত মানুষের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন গাইবান্ধা জেলার উদ্যোগে কামারজানিতে গত ২৪ জুন ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়। ফেডারেশনের গাইবান্ধা জেলা সভাপতি নুরনবী প্রধানের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি গোলাম রাব্বানী। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের গাইবান্ধা জেলার প্রধান উপদেষ্টা জনাব আব্দুল করিম।

চট্টগ্রামের বিএম ডিপোতে অগ্নিকাণ্ডে নিহত ও আহত শ্রমিকদের পরিবারকে শ্রমিক কল্যাণের পক্ষ থেকে পুর্নবাসন

কর্মস্থলে দুর্ঘটনার শিকার শ্রমিক পরিবারের দায়িত্ব রাষ্ট্র ও মালিকদের নিতে হবে : শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি কবির আহমাদ বলেছেন, প্রতি বছর অসংখ্য শ্রমিক কর্মস্থলে দুর্ঘটনার শিকার হয়ে আহত ও নিহত হচ্ছে। দুর্ঘটনার শিকার শ্রমিক পরিবারের খোঁজ কেউ রাখে না। এটি বড়োই বেদনাদায়ক। কর্মস্থলে দুর্ঘটনার শিকার শ্রমিক পরিবারের দায়িত্ব রাষ্ট্র ও মালিকদের নিতে হবে।

তিনি গত ২১ আগস্ট রবিবার বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের পুর্নবাসন প্রকল্পের অংশ হিসেবে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের বিএম ডিপোতে অগ্নিকাণ্ডে নিহত ও আহত শ্রমিক পরিবারের মাঝে সেলাই মেশিন, ছাগল ও কর্মসংস্থানের জন্য নগদ অর্থ প্রদান কালে এসব কথা বলেন। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক এস এম লুৎফর রহমান, বাঁশখালি উপজেলার সাবেক চেয়ারম্যান জহিরুল ইসলাম, ফেডারেশনের চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা সভাপতি নুরুল হোসাইন, উত্তর জেলা সাধারণ সম্পাদক জসিম উদ্দিন আযাদ, দক্ষিণ জেলা সাংগঠনিক সম্পাদক মুক্তার হোসেন শিকদার, কোষাধ্যক্ষ শরফুল আমিন চৌধুরী, সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান আরিফুল ইসলাম, দক্ষিণ বাঁশখালি উপজেলা সভাপতি মহিউদ্দিন প্রমুখ।

এই সময় তিনি বলেন, একজন শ্রমিকের শ্রমে মালিক যেমন ধনসম্পদের মালিক হয় ঠিক তেমনিভাবে রাষ্ট্রের অর্থনীতির চাকা সচল থাকে। শ্রমিকের শ্রমে যে রাষ্ট্র ব্যবস্থা গতিশীল থাকে সে রাষ্ট্র কিভাবে শ্রমিকের দুর্ঘটনার পরে নিশ্চুপ থাকে আমাদের বুঝে আসে না। আমাদের একটাই দাবি, শ্রমিকের যেকোন দুর্ঘটনার পর রাষ্ট্রকে শ্রমিকের কল্যাণে সর্বপ্রথম এগিয়ে আসতে হবে। শ্রম আইনের আলোকে মালিকদের থেকে শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ আদায় করে দিতে হবে। শুধু তাই নয় প্রয়োজনের তাগিদে রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে নিহত ও কর্মাক্ষম শ্রমিক পরিবারের পুর্নবাসন করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

কবির আহমাদ বলেন, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন এদেশের মেহনতি শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। যখনই কোন শ্রমিক বিপদে পতিত হয়েছে শ্রমিক কল্যাণ যথাসম্ভব চেষ্টা করেছে তার পাশে দাঁড়াতে। দেশের যেকোন দুর্যোগ-দুর্ভোগেও শ্রমিক কল্যাণ সেবার ব্রত নিয়ে ছুটে গেছে। ফেডারেশন তার ক্ষুদ্র সামর্থ্যের আলোকে যেখানে শ্রমিকের দুর্ভোগ দেখেছে সেখানে ছুটে গিয়েছে দুরন্ত গতিতে এবং সর্বোচ্চ ভূমিকা রাখার চেষ্টা করেছে।

কবির আহমাদ ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যদের উদ্দেশ্যে বলেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ভয়, ক্ষুধা এবং ধনসম্পদ, জীবন ও ফল-ফসলের

ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা বান্দাদের পরীক্ষা করেন। এই পরীক্ষায় যারা ধৈর্যের সাথে মোকাবিলা করে তারাই সফলকাম। সুতরাং আমরা যারা আজকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি তাদের ভয়ের কিছু নেই। নিঃসন্দেহে আল্লাহ আমাদের কাল কেয়ামতের ময়দানে উত্তম পুরস্কার দান করবেন।

সিলেট বিয়ানীবাজার উপজেলায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের পূর্ণবাসনে সহযোগিতা

শ্রমিকরা অনাহারে-অর্ধাহারে মানবেতর জীবন-যাপন করছে : এডভোকেট আতিকুর রহমান

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আতিকুর রহমান বলেছেন, সমাজের কিছু লোক অসহায় শ্রমিকদের ঘাম ও রক্তের বিনিময়ে সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলেছে। অথচ লাখ লাখ শ্রমিক ক্ষুধার জ্বালায় রোগে-শোকে আহাজারী করে অর্ধাহারে-অনাহারে মানবেতর জীবন-যাপন করছে।

তিনি ১৪ জুলাই বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন সিলেট জেলা দক্ষিণের বিয়ানীবাজার উপজেলার উদ্যোগে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের জন্য আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। উপজেলা সভাপতি আব্দুল হামিদের সভাপতিত্বে ও উপজেলা সাধারণ সম্পাদক জামিল আহমদ-এর সঞ্চালনায় এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক মাওলানা সোহেল আহমদ, সিলেট জেলা দক্ষিণের সভাপতি ফখরুল ইসলাম খান, সাধারণ সম্পাদক আতিকুল ইসলাম, পৌরসভার প্রধান উপদেষ্টা মস্তফা উদ্দিন, মুড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ফরিদ আল মামুন, উপজেলার উপদেষ্টা আবুল কাশেম চৌধুরী।

এসময় তিনি বিয়ানীবাজার উপজেলার বিভিন্নস্থানে ও মুড়িয়া ইউনিয়নের হিন্দু পাড়ায় খাদ্য সামগ্রী ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে টিউবওয়েল, টিন, পাকা পিলারসহ নানা সামগ্রী বিতরণ করেন।

আতিকুর রহমান বলেন, পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শে বিশ্বাসী একদল মানুষ শ্রমিকদের ভাগ্য পরিবর্তন ও শ্রমিকরাজ কায়েমের মিথ্যা শ্লোগান দিয়ে শ্রমজীবী মানুষদের ধোঁকা দিয়ে যাচ্ছে। তারা শ্রমিকদের অর্থনৈতিক মুক্তির স্বপ্ন দেখিয়ে মানবরচিত মতবাদের মাধ্যমে মেহনতি শ্রমিকদের গোলামির জিঞ্জিরে বন্দি করে রেখেছে। তারা শ্রমিকদের সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করেছে। কিন্তু ক্ষমতা পেয়ে শ্রমিকদের অবদান ভুলে গেছে। অথচ তাদের স্বার্থ হাসিলের জন্য কতশত শ্রমিককে জীবন দিতে হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, কোভিড-১৯ এর লকডাউনে দেখা গেছে শ্রমিকরা কতটা অসহায় ও নিঃস্ব। শ্রমিকের ঘরে ঘরে খাবারের জন্য আহাজারী ও চিৎকারে আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে গিয়েছিল। করোনার দুঃসময় কাটিয়ে এখনো উঠতে পারেনি অসংখ্য শ্রমিক। ঠিক এই সময়ে সিলেট, সুনামগঞ্জ ও দেশের বৃহৎ একটি অংশে ভয়াবহ বন্যা চলছে। এই বন্যায় আবারও সবচেয়ে বেশি ক্ষতির সম্মুখীন দিন এনে দিনে খাওয়া শ্রমিকরা।

আতিকুর রহমান বলেন, মানবরচিত কোন তত্ত্ব দিয়ে শ্রমজীবী মানুষের সমস্যার সমাধান হবে না। এটি আজ দিবালোকের মত স্পষ্ট। আমরা যদি শ্রমিক সমস্যার স্থায়ী সমাধান চাই তাহলে আমাদেরকে ইসলামী শ্রমনীতির রিদকে ফিরে যেতে হবে। এছাড়া আমাদের সামনে আর কোন পথ খোলা নেই।

বানভাসি মানুষের সাথে ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করুন : শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আতিকুর রহমান বলেছেন, দেশের একটি বৃহৎ অংশ এখনো বন্যার পানিতে ডুবে আছে। ঠিক এই সময় আমাদের মাঝে ঈদুল আজহা সমাগত। ঈদ মানে আনন্দ, ঈদ মানে খুশি। এইবারের ঈদ বানভাসি মানুষের কাছে অত্যন্ত কষ্টদায়ক। বানভাসী মানুষের এই কষ্ট দূর করে তাদের মাঝে আমাদেরকে ঈদের আনন্দ ছড়িয়ে দিতে হবে। বানভাসি মানুষের সাথে ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করতে হবে। এটি হবে এইবারের ঈদে আমাদের অঙ্গীকার।

তিনি গত ৭ জুলাই বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন মৌলভীবাজার জেলার উদ্যোগে কুলাউড়া উপজেলা উদ্যোগে বানভাসি শ্রমজীবী মানুষের মাঝে ঈদ সামগ্রী বিতরণকালে এসব কথা বলেন। এই সময় উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের সিলেট মহানগর সভাপতি এডভোকেট জামিল আহমদ রাজু, কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ সদস্য মাওলানা ফারুক আহমদ, মৌলভীবাজার জেলা সভাপতি আলাউদ্দিন শাহ, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মুমিত, কুলাউড়া উপজেলা সভাপতি বেলাল আহমদ চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক সুলতান আহমদ প্রমুখ।

আতিকুর রহমান বলেন, ঈদের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো সমাজের অসহায় ও নিঃস্ব মানুষদের সহযোগিতা করা। আমাদের দেশে খেটে খাওয়া শ্রমিকরা সবচেয়ে বেশি অসহায়। এই বছর বৃহত্তর সিলেটসহ দেশের একটি বড়ো অংশে বন্যা চলছে। বন্যা কবলিত অঞ্চলের শ্রমিকরা কর্মহীন হয়ে পড়েছে। আজ তাদের ঘরে খাবার নেই। বন্যার কারণে সৃষ্ট রোগের চিকিৎসা করবে এমন টাকাও নেই। ঠিক এই মুহূর্তে ঈদুল আজহা আমাদের মাঝে সমাগত। শ্রমিক পরিবারের সন্তানরা পিতা-মাতার দিকে চেয়ে থাকে অন্তত ঈদে তারা একটি নতুন জামা পাবে। এই সংকটে শ্রমিকরা তাদের সন্তানদের মুখে হাসি ফোঁটাতে পারবে না। এমতাবস্থায় সমাজের বিত্তবান ও বিভিন্ন কল্যাণমুখী সংগঠনকে শ্রমজীবী মানুষ ও তাদের সন্তানদের মুখে হাসি ফোঁটাতে এগিয়ে আসতে হবে।

তিনি আরও বলেন, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন বন্যার শুরু থেকে দেশের বিভিন্ন স্থানে বন্যা কবলিত মানুষের পাশে ভালোবাসা ও সহমর্মিতা নিয়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে যাচ্ছে। আমরা চাই এই সংকটে একজন শ্রমিকও যেন মনে না করে তিনি বড়ো অসহায়। আমরা আমাদের সামর্থ্যের সবটুকু ঢেলে দিয়ে প্রতিটি শ্রমিকের জীবনকে স্বাভাবিক প্রবাহে ফিরিয়ে আনতে বদ্ধ পরিকর। শ্রমিক কল্যাণের প্রতিটি নেতাকর্মী অতীতের যেকোন দুর্যোগের ন্যায় এইবারের বন্যায় বানভাসি মানুষের পাশে ছিল। আমরা প্রত্যাশা করছি এইবারের ঈদেও শ্রমিক কল্যাণের নেতাকর্মীরা যেভাবে পরিবারের সাথে ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করে ঠিক একই ভাবে বন্যা কবলিত বানভাসি মানুষের সাথে ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করে নিবে।

কিশোরগঞ্জের বিভিন্ন স্থানে বন্যা দুর্গত মানুষের মাঝে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ত্রাণ বিতরণ

বানভাসি মানুষরা মানবেতর জীবন-যাপন করছে : শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আতিকুর রহমান বলেছেন, যেকোন দুর্যোগ-দুর্ভোগে আত্মমানবতার সেবায় ঝাঁপিয়ে পড়া মানুষের একান্ত কর্তব্য। মানুষ মানুষের জন্য। আজকে যারা ভালো আছে আগামীকাল তারা যে দুর্ভোগে পতিত হবে না এটি বলা যায় না। তাই কোন মানুষ বা জনগোষ্ঠী বিপদের সম্মুখীন হলে অন্য জনগোষ্ঠীর দায়িত্ব হচ্ছে দুর্ভোগে পড়া জনগোষ্ঠীর সাহায্যার্থে এগিয়ে আসা। চলমান বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ বানভাসি মানুষরা মানবেতর জীবন-যাপন করছে। আজকে তাদের পাশে সমাজের সামর্থ্যবান মানুষদের দাঁড়াতে হবে।

তিনি গত ২৫ জুন কিশোরগঞ্জ জেলার ইটনা উপজেলার বিভিন্ন আশ্রয়কেন্দ্রে বন্যা কবলিত বানভাসি মানুষের মাঝে ত্রাণ বিতরণ কালে এসব কথা বলেন। ফেডারেশনের কিশোরগঞ্জ জেলার উদ্যোগে ত্রাণ বিতরণ কালে আরও উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক নুরুল আমিন, বিশিষ্ট আইনজীবী শেখ রোকন রেজা, ফেডারেশনের জেলা সভাপতি খালেদ হাসান জুম্মন, ইটনা উপজেলার প্রধান উপদেষ্টা আবুল হোসেন, সদর উপজেলা সভাপতি সাইফুল ইসলাম প্রমুখ।

আতিকুর রহমান বলেন, চলমান বন্যায় বহু মানুষকে ঘর-বাড়ি ছেড়ে আশ্রয় কেন্দ্রে উঠতে হয়েছে। আশ্রয় কেন্দ্রে তাদেরকে মানবেতর জীবন-যাপন করতে হচ্ছে। যে সংখ্যক মানুষ আশ্রয় কেন্দ্রে রয়েছে তাদের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্য ও ঔষুধের সংকট রয়েছে। বানভাসি মানুষদের এই দুর্ভোগ থেকে উদ্ধারের জন্য সামর্থ্যবান মানুষ ও বিভিন্ন সংস্থাকে এগিয়ে আসতে হবে। শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন তার সাধ্যানুযায়ী দেশের বিভিন্ন স্থানে বন্যা কবলিত মানুষের পাশে দাঁড়াতে চেষ্টা করে যাচ্ছে। এই উদ্যোগ দুর্যোগ শেষ না হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

সিলেট মহানগর পরিবহন শ্রমিকদের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ

বাংলাদেশ পরিবহন শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সিলেট মহানগরের উদ্যোগে বন্যা দুর্গত পরিবহন শ্রমিকদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করেন পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি কবির আহমাদ। এই সময় আরও উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক মাওলানা সোহেল আহমাদ, সিলেট মহানগর সভাপতি এডভোকেট জামিল আহমাদ রাজু, সাধারণ সম্পাদক মিয়া মোহাম্মদ রাসেল প্রমুখ।

সিলেট জেলা দক্ষিণের শাখার উদ্যোগে বানভাসি শ্রমিকদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন সিলেট জেলা দক্ষিণ শাখার দক্ষিণ সুরমা উপজেলার চন্ডিপুল এলাকায় বন্যাকবলিত বিভিন্ন পেশার অর্ধশত শ্রমিকদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। উপজেলা সভাপতি কামরুজ্জামান খান ফয়সলের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হুদা তারেকের পরিচালনায় খাদ্য সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে শ্রমিকদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ সাধারণ সম্পাদক ও সিলেট অঞ্চল পরিচালক মাওলানা সোহেল আহমদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিলেট জেলা দক্ষিণের সভাপতি ফখরুল ইসলাম খান। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন বালাগঞ্জ উপজেলা সভাপতি এহসান রশিদ রাজু, শ্রমিক নেতা আলী আহমদ, আব্দুল মতিন, আলী হোসেন, দবির আহমদ, রুহুল আমীন, সিএনজি চন্ডিপুল শাখার সভাপতি মাহমুদ আলী, ইয়াসিন আহমদ প্রমুখ।

ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলার উদ্যোগে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত বিভিন্ন পেশার শ্রমজীবীদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন সিলেট জেলা দক্ষিণের ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলার উদ্যোগে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত বিভিন্ন পেশার শ্রমজীবীদের

মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। উপজেলা সভাপতি রুকুনুজ্জামান চৌধুরীর সভাপতিত্বে ও গীলাছড়া ইউনিয়ন সভাপতি কামরান আহমদের পরিচালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে শ্রমজীবীদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন ফেডারেশনের সিলেট জেলার সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান সাইফুল্লাহ আল হোসাইন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের জেলা দক্ষিণের সভাপতি ফখরুল ইসলাম খান, উপজেলা প্রধান উপদেষ্টা এমরান আহমদ চৌধুরী, উপদেষ্টা ফখরুল ইসলাম ও আমিনুর রহমান জুয়েল। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের উপজেলা সহ-সভাপতি কুতুব উদ্দিন ও আব্দুল কাদির ফজল, মাওলানা আজিম উদ্দিন, মাওলানা আব্দুল হান্নান, জহিরুল ইসলাম, নিয়াজ আহমদ লালন, শোয়েব চৌধুরী, শ্রমিক নেতা কৃষিবিদ আব্দুল মান্নান, ফখরুজ্জামান, মনসুর আহমদ, সাদিকুর রহমান প্রমুখ।

ওসমানী নগর উপজেলার বুরুঙ্গা ইউনিয়নে শ্রমজীবী মানুষের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন সিলেট জেলা দক্ষিণের ওসমানী নগর উপজেলার উদ্যোগে বন্যাকবলিত বুরুঙ্গা ইউনিয়নে শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। বুরুঙ্গা ইউনিয়ন সভাপতি আব্দুল ওয়াদুদের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে ত্রাণ বিতরণ করেন ফেডারেশনের সিলেট জেলা দক্ষিণের সভাপতি ফখরুল ইসলাম খান। ত্রাণ বিতরণ কালে উপস্থিত ছিলেন জেলা ট্রেড ইউনিয়ন সম্পাদক মাজাহারুল হক, ওসমানী নগর উপজেলা সভাপতি আব্দুল মুমিন, ফেডারেশনের সাবেক উপজেলা সভাপতি সাফির আহমদ, সাবেক ছাত্রনেতা জামিল চৌধুরী, শ্রমিকনেতা শামীম আহমদ, ফরহাদ আহমদ, মোঃ আলী সেলিম মিয়া প্রমুখ।

হবিগঞ্জ জেলার উদ্যোগে বানভাসি মানুষের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন হবিগঞ্জ জেলার উদ্যোগে বানিয়াচং উপজেলায় বানভাসি মানুষের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। এই সময় উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের উপজেলার সাবেক প্রধান উপদেষ্টা কাজী আব্দুর রাজ্জাক, প্রধান উপদেষ্টা হাবিবুর রহমান, ফেডারেশনের জেলা সভাপতি কাজী আব্দুর রউফ বাহার, বানিয়াচং উপজেলা সভাপতি মাহবুবুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক মোঃ মোজ্জামেল প্রমুখ।

রংপুর মহানগরীর উদ্যোগে বন্যা দুর্গত মানুষের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের রংপুর মহানগরের উদ্যোগে গংগাচড়া উপজেলার লক্ষীটারী ইউনিয়নের বন্যা দুর্গত মানুষের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করেন ফেডারেশনের মহানগর সভাপতি এডভোকেট কাওছার আলী। এই সময় আরও উপস্থিত ছিলেন রংপুর জেলা সভাপতি আব্দুল গনী, গংগাচড়া উপজেলার উপদেষ্টা রায়হান উদ্দিন সিরাজ, ফেডারেশনের উপজেলা সভাপতি বেলাল হোসেন।

সভা সমাবেশ

কুমিল্লা অঞ্চলের দায়িত্বশীল বৈঠক অনুষ্ঠিত

শ্রমজীবী মানুষের মুক্তির জন্য ইসলামী শ্রমনীতির আন্দোলনকে আরও বেগবান করতে হবে : এটিএম মাসুম

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা মাওলানা এটিএম মাসুম বলেছেন, দেশের শতকরা ৮০ ভাগ মানুষ শ্রমজীবী। শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে অধিকাংশ শ্রমিকের মজুরি বর্তমানের বাজারের তুলনায় খুবই সামান্য। সামান্য মজুরি দিয়ে এই সকল শ্রমিকদের ঘর-সংসার চালানো খুবই মুশকিল। তারা কোন ভাবে দুবেলা দুমুঠো ভাত খেয়ে বেঁচে থাকে। যতদিন না দেশে ইসলামী শ্রমনীতি প্রতিষ্ঠিত হবে ততদিন পর্যন্ত শ্রমিকদের মুক্তি হবে না। ইসলামী শ্রমনীতি প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে তাই আরও বেগবান করতে হবে।

তিনি গত ২৪ জুন শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কুমিল্লা অঞ্চলের দায়িত্বশীল বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। অঞ্চল পরিচালক ও ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আতিকুর রহমান-এর সভাপতিত্বে এবং অঞ্চল সহকারী পরিচালক ও ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ড. সৈয়দ সরওয়ার উদ্দিন সিদ্দিকী-এর পরিচালনায় এতে অঞ্চলের সকল শাখা সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এটিএম মাসুম বলেন, দুনিয়াবী কোন মতবাদ দিয়ে শ্রমজীবী মানুষের মুক্তি সম্ভব না। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ও আল্লাহর রাসুল (সা) এর দেখানো পথে শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণ নিহিত রয়েছে। ইসলামী শ্রমনীতি শুধু ইসলাম ধর্মালম্বী মানুষের জন্য না। বরং এটি সকল ধর্ম-মতের মানুষের জন্য অনুকরণীয় একটি আদর্শিক শ্রমনীতি। ইসলামী শ্রমনীতি শ্রমিকের স্বার্থ রক্ষার পাশাপাশি মালিকেরও স্বার্থ রক্ষা করেছে। এটি একটি ভারসাম্যমূলক নীতি। তাই ইসলামী শ্রমনীতির পক্ষে ইতোমধ্যে জোয়ার সৃষ্টির হয়েছে। আগামী দিনে এই জোয়ারকে আরও বেশি ছড়িয়ে দিতে হবে।

বরিশাল সদর উপজেলা দর্জি শ্রমিক ইউনিয়নের অফিস উদ্বোধন ও সদস্যদের মাঝে আইডি কার্ড বিতরণ

অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের জন্য ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে : শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি লস্কর মুহাম্মদ তসলিম বলেছেন, দেশের অর্থনীতি সচল রাখতে শ্রমিকদের ভূমিকা অপরিসীম। প্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের পাশপাশি

অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকরা দেশকে এগিয়ে নিতে দিন রাত পরিশ্রম করে যাচ্ছে। প্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শ্রমিকরা কিছুটা অধিকার ও সুযোগ সুবিধা পেলেও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকরা সকল ধরনের অধিকার থেকে বঞ্চিত। এই সকল শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের জন্য ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।

তিনি গত ২৬ জুলাই মঙ্গলবার বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন বরিশাল মহানগরের অন্তর্ভুক্ত বরিশাল সদর উপজেলা দর্জি শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে নতুন অফিস উদ্বোধন উপলক্ষ্যে আয়োজিত সদস্য সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। ইউনিয়ন সভাপতি জাকির হোসেন-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আল আমিন-এর সঞ্চালনায় এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের মহানগরের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যক্ষ জহির উদ্দিন বাবর। আরও উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের অঞ্চল টিম সদস্য মশিউর রহমান, ফেডারেশনের মহানগর সাধারণ সম্পাদক জাফর ইকবাল, সহ-সাধারণ সম্পাদক মাহমুদ হাসান কামাল প্রমুখ।

লস্কর তসলিম বলেন, ট্রেড ইউনিয়ন করা শ্রমিকের ন্যায্য অধিকার। ট্রেড ইউনিয়নের মাধ্যমে একজন শ্রমিক তার প্রাপ্য অধিকার আদায়ের সুযোগ পায়। শ্রমিকের ওপর কোন আঘাত আসলে সকল শ্রমিকরা মিলে তার প্রতিবাদ করতে পারে। তাই শ্রমিকের অধিকার ফিরে পাওয়ার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের পাশাপাশি অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত শ্রমিকদের নিয়ে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করতে হবে। দলমত উর্ধ্বে উঠে সকল শ্রমিকদের একই ছায়াতলে নিয়ে আসতে হবে। প্রকৃত আদর্শ, সততা ও বিশ্বাস নিয়ে নেতৃবৃন্দ কাজ করতে পারলে ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রমে শ্রমিকরা স্বেচ্ছায় সম্পৃক্ত হবে।

তিনি আরও বলেন, ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দকে শ্রমিকের অধিকারের ব্যাপারে সর্বদা সজাগ থাকতে হবে। কোনভাবে যেন ইউনিয়নের একজন্য সদস্য মনে করতে না পারে ইউনিয়ন তার অধিকার আদায়ে ভূমিকা রাখতে পারছে না। একই সাথে আদর্শিক সততা, বিশ্বাস ও শ্রমিকদের প্রতি নিঃস্বার্থ ভালোবাসা নিয়ে ইউনিয়নের কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।

লোহাগাড়া উপজেলার উদ্যোগে উপজেলা কার্যকরী পরিষদের অধিবেশন ও ইউনিট সভাপতি সম্মেলন অনুষ্ঠিত

শ্রমিকদের কাছে ইসলামের সুমহান দাওয়াত পৌঁছে দিতে হবে : এডভোকেট আতিকুর রহমান

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আতিকুর রহমান বলেছেন, ইসলাম শ্রমজীবী মানুষদের বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত করেছে। শ্রমিকদের সম্মান ও পূর্ণ অধিকার একমাত্র ইসলামই নিশ্চিত করেছে। আমাদের দেশে শ্রমিকদের কাছে ইসলামের আলো এখনো পৌঁছায়নি। শ্রমিকদের কল্যাণের তাগিদে তাই সর্বপ্রথম শ্রমিকদের কাছে ইসলামের সুমহান দাওয়াত পৌঁছে দিতে হবে।

তিনি গত ০৯ আগস্ট মঙ্গলবার চট্টগ্রামের একটি মিলনায়তনে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম জেলা দক্ষিণের লোহাগাড়া উপজেলার উদ্যোগে উপজেলা কার্যকরী পরিষদের অধিবেশন ও ইউনিট সভাপতি সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। উপজেলা সভাপতি মুহাম্মদ শফিউল আলম-এর সভাপতিত্বে এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক এস এম লুৎফর রহমান, চট্টগ্রাম জেলা দক্ষিণের সভাপতি নুর হোসাইন, কক্সবাজার জেলা সভাপতি শামসুল আলম বাহাদুর, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ মুহসিন, লোহাগাড়া উপজেলার উপদেষ্টা অধ্যাপক আবু তাহের প্রমুখ।

আতিকুর রহমান বলেন, শ্রমিক শ্রেণির মাঝে ইসলামের আলো জ্বালাতে হবে। এই জন্য সর্বপ্রথম তাদের কাছে ইসলামের সুমহান বাণী তুলে ধরতে হবে। সত্য ও সুন্দরের পথ শ্রমিকরা অস্বীকার করতে পারবে না। বরং প্রকৃত সত্যের সন্ধান পেলে তারা এই পথে নিজেদের জোরালোভাবে শামিল করবে। শ্রমিকরা যখন ইসলামের পতাকাবাহী সংগঠনের নিচে শামিল হবে তখন সেখানে স্বাভাবিকভাবে সংগঠন শক্তিশালি হয়ে উঠবে। আর এই কাজ তখন সার্থকভাবে গড়ে উঠবে যখন পরিকল্পিতভাবে শ্রমিক ময়দানে কাজ করা হবে। এক্ষেত্রে নেতৃবৃন্দকে শ্রমিক সেবাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। শ্রমিকদের যেকোন সমস্যা সমাধানে নেতৃত্ব দিতে হবে। যেকোন ভয়-ভীতি দূরে ঠেলে শ্রমিকদের স্বার্থকে প্রাধান্য দিতে হবে। তাহলে শ্রমিকরা ইসলামী শ্রমনীতির যথার্থতা উপলব্দি করতে পারবে। ইসলামী শ্রম আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের ভূমিকা ও অন্যান্য মতাদর্শের নেতৃবৃন্দের পার্থক্য দিনের আলোর ন্যায় প্রকাশ পাবে।

আতিকুর রহমান বলেন, আ ন ম শামসুল ইসলাম ও শাহজাহান চৌধুরী লোহাগড়া-সাতকানিয়ার দুই বীর সন্তান। তারা আজ কারারুদ্ধ। অন্যায় অবিচার ও জুলুমের বিপক্ষে কথা বলার কারণে জালিম শক্তি তাদেরকে কারাগারের অন্ধপ্রকোষ্ঠে নিক্ষেপ করেছে। আ ন ম শামসুল ইসলাম শ্রমিকদের প্রাণপ্রিয় সংগঠন শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি। আমরা তাদের দুজনকে দ্রুত মুক্তি দেওয়ার জন্য সরকারের কাছে জোর দাবি জানাচ্ছি।

কক্সবাজার উপজেলা প্রতিনিধি ও ট্রেড ইউনিয়ন দায়িত্বশীল সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কক্সবাজার জেলার উপজেলা প্রতিনিধি ও ট্রেড ইউনিয়ন দায়িত্বশীল সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। জেলা সভাপতি শামসুল আলম বাহাদুরের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ মহসিনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি কবির আহমদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক এস এম লুৎফর রহমান। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন কক্সবাজার জেলা সহ-সভাপতি ও হোটেল রেস্তোরাঁ শ্রমিক ইউনিয়ন সভাপতি আমিনুল ইসলাম হাসান, জেলা সহ-সভাপতি ও পরিবহন সেক্টর জেলা সভাপতি নুরুল ইসলাম, জেলা সাংগঠনিক সম্পাদক এম ইউ বাহাদুর, কোষাধ্যক্ষ ও দর্জি শ্রমিক ইউনিয়ন সভাপতি জসিম উদ্দিন, কক্সবাজার সদর উপজেলা সভাপতি মোস্তাক আহমেদ, পেকুয়া উপজেলা সভাপতি

দিদারুল ইসলাম, পর্যটন অঞ্চল সভাপতি মুহাম্মদ শাহজাহান, রামু উপজেলা সভাপতি ও এক্সরে প্যাথলজি শ্রমিক ইউনিয়ন সভাপতি মোক্তার আহমেদ, উখিয়া উপজেলা সভাপতি ও ফার্নিচার শ্রমিকনেতা সরোয়ারুল ইসলাম, টেকনাফ উপজেলা সভাপতি কলিম উল্লাহ বাহারী, চকরিয়া পৌরসভা সভাপতি ও চকরিয়া দোকান কর্মচারী কল্যাণ সভাপতি শওকত আলম, চকরিয়া উত্তর সভাপতি আব্দুল্লাহ বাহাদুর, ঈদগাঁহ উপজেলা সভাপতি কামাল পাশা, মহেশখালী উত্তর সভাপতি আনসারুল্লাহ প্রমুখ।

শোক বাণী

শ্রমিক নেতা আব্দুল মুমিনের পিতার ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ সদস্য ও নারায়ণগঞ্জ মহানগর সভাপতি শ্রমিক নেতা আব্দুল মোমিন এর সম্মানিত পিতা হাফেজ মোঃ ইলিয়াস-এর (৯৭) ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান ও সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আতিকুর রহমান। নেতৃবৃন্দ বলেন, হাফেজ মোঃ ইলিয়াস একজন হাফেজে কোরআন এবং আলেমে দ্বীন ছিলেন। তিনি মেহনতি মানুষের মুক্তির জন্য ইসলামী শ্রমনীতির আন্দোলনকে আরও জোরদার করতে আমাদেরকে সুচিন্তিত পরামর্শ ও উৎসাহ দিয়েছেন। তার ইন্তেকালে আমরা একজন অভিভাবককে হারালাম।

শোকবার্তায় নেতৃবৃন্দ মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন ও তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। নেতৃবৃন্দ মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে মরহুমের নেক আমল সমূহ কবুল করে তাকে জান্নাতবাসী ও আত্মীয়স্বজনকে ধৈর্য ধরার শক্তি দান করার জন্য দোয়া করেন।

উল্লেখ্য মরহুম হাফেজ মোঃ ইলিয়াস গত ২ জুলাই রাত ৭:৪০ মিনিটে নিজ বাড়িতে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না-ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ৮ পুত্র ও ১ মেয়েসহ অসংখ্য আত্মীয় স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। মরহুমের জানাযা নামাজ ২ জুলাই রাত ১১:৩০ টায় নারায়ণগঞ্জের মুসলিমনগর সরকারি শিশু পরিবার মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। জানাযা শেষে মরহুমকে স্থানীয় কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে।

মরহুমের জানাযায় অংশগ্রহণ করেন শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আলমগীর হোসাইন, দপ্তর সম্পাদক নুরুল আমিন, মহানগরের উপদেষ্টা আবদুল জব্বার, আব্দুল কাইয়ুম, জেলার উপদেষ্টা মমিনুল হক পাটোয়ারী, জাকির হোসেনসহ ফেডারেশনের মহানগর ও জেলার নেতৃবৃন্দ।

শ্রমিক নেতা কবির আহমেদের ভাইয়ের ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি কবির আহমদ-এর শ্রদ্ধেয় বড়ো ভাই ইউসুফ মিজি (৫৮)-এর ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান ও সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আতিকুর রহমান। নেতৃবৃন্দ বলেন, মরহুম ইউসুফ মিজি ইসলামী শ্রম আন্দোলনের একজন নিবেদিতপ্রাণ অভিভাবক ছিলেন। তিনি ইসলামী শ্রমনীতি বাস্তবায়নের জন্য আমাদেরকে সুচিন্তিত পরামর্শ ও উৎসাহ দিয়েছেন। তার ইন্তেকালে আমরা একজন নিবেদিতপ্রাণ অভিভাবককে হারালাম।

শোকবার্তায় নেতৃবৃন্দ মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন ও তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। নেতৃবৃন্দ মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে মরহুমের নেক আমল সমূহ কবুল করে তাকে জান্নাতবাসী ও আত্মীয়স্বজনকে ধৈর্য ধরার শক্তি দান করার জন্য দোয়া করেন।

উল্লেখ্য মরহুম ইউসুফ মিজি গত ১৫ জুলাই শুক্রবার সকাল মাগরিবের পূর্ব মুহূর্তে নিজ বাড়িতে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না-ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তিনি ২ পুত্র ও ১ মেয়েসহ অসংখ্য আত্মীয় স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। মরহুমের জানাযা নামাজ গত ১৬ জুলাই শনিবার সকাল ১০ টায় মরহুমের গ্রামের বাড়ি ফেনীতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। জানাযায় ইমামতি করেন মরহুমের ছোট ভাই কবির আহমদ। জানাযা শেষে মরহুমকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে।

মরহুমের জানাযায় অংশগ্রহণ করেন শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা অধ্যাপক লিয়াকত আলী, ফেনী জেলার প্রধান উপদেষ্টা একেএম সামছুদ্দীন, ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সালাম, কেন্দ্রীয় আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক এডভোকেট জাকির হোসেন, ফেডারেশনের ফেনী জেলা সাধারণ সম্পাদক ফারুক হোসেনসহ বিভিন্ন পর্যায়ের শ্রমিক-জনতা।

শ্রমিক নেতা আলী আকবর মোড়লের পিতার ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের খুলনা জেলা উত্তরের সাধারণ সম্পাদক মোঃ আলী আকবর মোড়ল-এর সম্মানিত পিতা মোঃ আক্কাস আলী মোড়ল-এর (৯৬) ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান ও সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আতিকুর রহমান। নেতৃবৃন্দ বলেন, মোঃ আক্কাস আলী মোড়ল ইসলামী শ্রমনীতির বাস্তবায়নের জন্য আমাদেরকে প্রতিনিয়ত সুচিন্তিত পরামর্শ ও উৎসাহ দিয়েছেন। তার ইন্তেকালে আমরা একজন অভিভাবককে হারালাম।

শোকবার্তায় নেতৃবৃন্দ মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন ও তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। নেতৃবৃন্দ মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে মরহুমের নেক আমল সমূহ কবুল করে তাকে জান্নাতবাসী ও আত্মীয়স্বজনকে ধৈর্য ধরার শক্তি দান করার জন্য দোয়া করেন।

উল্লেখ্য মরহুম মোঃ আক্কাস আলী মোড়ল গত ১২ জুলাই সকাল ১০ টায় বার্ধক্যজনিত কারণে নিজ বাড়িতে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না-ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ৫ পুত্র ও ৩ মেয়েসহ অসংখ্য আত্মীয় স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। মরহুমের জানাযা নামাজ গত ১২ জুলাই বাদ আসর জুন্নীপাশা কেন্দ্রীয় ঈদগাহে অনুষ্ঠিত হয়েছে। জানাযায় ইমামতি করেন মরহুমের বড়ো ছেলে আলী আকবর মোড়ল। জানাযা শেষে মরহুমকে স্থানীয় কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে।

মরহুমের জানাযায় অংশগ্রহণ করেন শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের খুলনা জেলা উত্তরের উপদেষ্টা মুন্সী মিজানুর রহমান, মুন্সী মইনুল ইসলাম, ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় ত্রাণ ও দুর্যোগ পুনর্বাসন সম্পাদক খান গোলাম রাসুল, খুলনা জেলা উত্তরের সভাপতি গোলাম মোস্তফা আল মুজাহিদ, ফুলতলা উপজেলার প্রধান উপদেষ্টা মোঃ আব্দুল আলিম মোল্যা প্রমুখ।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটির সকল বই আকর্ষনীয় ছাড়ে বিক্রয় চলছে!!!

বুক সোসাইটির নতুন বইসমূহ

তাজরীদুল বোখারী(১ম ও ২য় খন্ড)

মুদ্রিত মূল্য ১৬০০ টাকা, বিক্রয় মূল্য ১০০০ টাকা

অনলাইনে বই কিনলেই ৫০% ছাড়! শর্ত প্রযোজ্য

বুক সোসাইটির ওয়েবসাইট ভিজিট করুন:
www.booksocietyltd.com

বুক সোসাইটির ২৮৯টি বইয়ের মধ্যে নিম্নে উল্লেখযোগ্য বইসমূহ উল্লেখ করা হলো

ক্রমিক নং	বই ও লেখকের নাম	মূল্য
০১।	শেষ মাজুরা- শহীদ সিরাজী	৪০০/-
০২।	দুধ মাছ গল্প- শহীদ সিরাজী	৪৫০/-
০৩।	[illegible]- শহীদ সিরাজী	৩৫০/-
০৪।	[illegible]- শহীদ সিরাজী	১২০/-
০৫।	[illegible]- শহীদ সিরাজী	১৫০/-
০৬।	রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ গল্প- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৪৫০/-
০৭।	[illegible]- আব্দুল আহাদ	৩৫০/-
০৮।	[illegible]	২০০/-
০৯।	[illegible]	১৫০/-
১০।	[illegible]	৮০/-
১১।	[illegible]	১০০/-
১২।	[illegible]	১০০/-
১৩।	[illegible]	১২০/-
১৪।	[illegible]	২০০/-
১৫।	[illegible]	১২০/-
১৬।	[illegible]- শহীদ সিরাজী	৮০/-
১৭।	[illegible]	২৫০/-
১৮।	[illegible]	৫০/-
১৯।	[illegible]	৪০০/-
২০।	[illegible]	৫০০/-
২১।	[illegible]	২০০/-
২২।	[illegible]	৩৫০/-
২৩।	[illegible]	৩০০/-
২৪।	[illegible]	৪০০/-
২৫।	[illegible]	১২০/-
২৬।	[illegible]	২৫০/-
২৭।	[illegible]	৬০/-
২৮।	[illegible]	৫০০/-
২৯।	[illegible]	৮০/-
৩০।	[illegible]	৪০০/-
৩১।	[illegible]	৭৫০/-
৩২।	[illegible]	৫০০/-
৩৩।	[illegible]	৩০০/-
৩৪।	[illegible]	১৫০/-
৩৫।	[illegible]	৪৫/-
৩৬।	[illegible]	১২০/-
৩৭।	[illegible]	১৫০/-
৩৮।	[illegible]	৩০০/-
৩৯।	[illegible]	২৫০/-
৪০।	[illegible]	১৫০/-
৪১।	[illegible]	১০০/-
৪২।	[illegible]	১৫০/-
৪৩।	[illegible]	৩০০/-
৪৪।	[illegible]	৩০০/-
৪৫।	[illegible]	১২৫/-
৪৬।	[illegible]	১২৫/-
৪৭।	[illegible]	১০০/-
৪৮।	[illegible]	১৫০/-
৪৯।	[illegible]	১২০/-
৫০।	[illegible]	১২০/-

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০ । ০১৩২২৬৮০০০১, ০১৭১১৮১৬০০১

অনলাইন পরিবেশক:- www.booksocietyltd.com ▪ facebook.com/booksocietyltd

১ম
সুমাইয়া
২য়
আব্দুল্লাহ
৪র্থ
সাদিয়া
ভর্তি চলছে
মেডিকেল ও ভার্সিটি ম্যাথ প্রোগ্রাম
প্রথম ২০ এ ১৬ জন
DMC তে ১৬৩ জন সহ সর্বমোট চান্সপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী ৩৩০০+ জন
রেটিনা
০১৭০৭ ৭৮১৭৭১-৬